কবিতা-কৌস্তুভ

তৃতীয় ভাগ

সাজাইয়া অর্ঘ্য দীন তোমাদেরই ফুলে।
আনিয়াছে উপহার বাণীর দেউলে॥

শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, কাব্যরত্ন

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক—

শ্রীনলিনীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

২১এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন

কলিকাতা।

প্রিন্টার—শ্রীভূতনাথ সরকার

ভিক্টোরিয়া প্রেস

২১এ মহেন্দ্র গোস্বামী লেন

কলিকাতা

নিবেদন

কবিদিগের রচনার মধ্য দিয়া, পাঠকগণের হৃদয়ে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ধারার আভাস দেওয়াই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থখানিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—প্রাচীন যুগ, চণ্ডীদাস হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত; যুগসন্ধি, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যুগ; নবীন যুগ, মাইকেল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত। প্রত্যেক যুগেরই প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করিয়াছি। যে সমস্ত কবির কথা স্বতন্ত্রভাবে বলিতে পারি নাই, তাঁহাদিগের কবিতা "সাজি" নাম দিয়া গ্রন্থের শেষে সংগৃহীত হইয়াছে।

যেখানেই কবিতা বুঝিবার পক্ষে প্রসঙ্গ-নির্দ্দেশ আবশ্যক বলিয়া বুঝিয়াছি, সেখানেই কবিতার মুখবন্ধস্বরূপ তাহার উল্লেখ করিয়াছি।

আজকাল কয়েকখানি উৎকৃষ্ট অভিধান প্রকাশিত হইলেও, ছাত্রগণের পক্ষে তাহা তাদৃশ সুলভ নহে, এবং তাহাদের একখানির দ্বারাও সমস্ত জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হয় না। এইজন্য পাদটীকা দিতে হইয়াছে।

কবিদিগের জীবন-চরিতে, যতদূর সম্ভব, তাঁহাদের বিশেষত্ব দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। উদ্ধৃত কবিতাগুলি সেই বিশেষত্বের

দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু, নানা কারণে, অনেক কবির বিশিষ্টতার সকল দিক্ দেখাইবার ইচ্ছা সংযত করিতে হইয়াছে। কোথাও সমালোচনার বাহুল্যে ছাত্রদিগের চিন্তাশক্তির স্বচ্ছন্দ-বিকাশে বাধা জন্মাইবার চেষ্টা করি নাই। যাহাতে ছাত্রগণ, মূল সূত্রগুলি ধরিয়া, কবি বা কবিতা সম্বন্ধে স্ব স্ব মত গঠন করিয়া লইতে পারে, ততটুকুমাত্রই বলিয়াছি।

এই গ্রন্থ-সঙ্কলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনেক সাহিত্য-সেবীরই শরণ লইয়াছি। কাহাকে বাদ দিয়া কাহার নাম করিব? অতএব সে চেষ্টা না করিয়া, আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে সকলেরই নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। সঙ্কলন-কালে যে কবিগণের অনুমতি লইতে পারি নাই, তাঁহাদের নিকট বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল, তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি জানি না। অনেক ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকাই সম্ভব। আশা করি, গ্রন্থের উৎকর্ষ-সাধনে সুধীগণের সানুগ্রহ উপদেশ-লাভে বঞ্চিত হইব না।

কবিরত্ন-ভবন
শিবপুর
শ্রাবণ, ১৩৩১

বিনীত—
গ্রন্থকার

সূচি

কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিতা-কৌস্তুভ

বঙ্গবাণী

(প্রাচীন যুগ)

মহীয়সী বঙ্গবাণী, জননি আমার,
গৌরব-মুকুট তব শোভিতেছে শিরে ;
প্রতীচ্য সাদরে করে লয়ে অর্ঘ্যভার,
করিতেছে পূজা, দেবি, তোমার কবিরে। ১

(১) মহীয়সী—(মহৎ+ঈয়স্‌, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌) অতিমহৎ। প্রতীচ্য—(প্রতীচী—পশ্চিম দিক্‌+য্য) পশ্চিম দিকে জাত অর্থাৎ য়ুরোপবাসীরা। অর্ঘ্য—পূজাসামগ্রী। প্রতীচ্য……কবিরে—ইংরাজী ভাষায় অনূদিত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ করিয়া য়ুরোপবাসীরা পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁহার প্রতিভার পূজা করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথ সুধীগণের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষমুদ্রা মূল্যের 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করিয়াছেন।

ছিলে তুমি পল্লীবাণী,—ছড়ায়, গাথায়,
আছিলে প্রকট নিত্য বঙ্গের কুটীরে ;
ধর্ম্মপ্রাণ পল্লী-কবি পূজিত তোমায়,
চণ্ডীর মণ্ডপে, কিংবা ধর্ম্মের মন্দিরে। ২

দেবভাষা-বংশে জন্ম, প্রাকৃত-দুহিতা,
না মিলিল স্থান তব বিদগ্ধ-সমাজে ;
মধ্যাহ্ন-গগনে যবে উদিত সবিতা,
দীপ্তিহীন ক্ষুদ্র দীপ বিমলিন লাজে। ৩

চণ্ডীদাস

সুসন্তান চণ্ডীদাস ঘুচাইল লাজ ;—
শুনাইল দীন দ্বিজ শ্যামের বাঁশরী ;
প্লাবিত করিয়া বঙ্গে ভাবুক-সমাজ,
ছুটিল মিথিলামুখে সে সুধা-লহরী। ৪

(২) গাথা—গান। ছড়ায় গাথায়……কুটীরে—বঙ্গের পল্লীগ্রামে প্রচলিত খনা ও ডাকের বচন প্রভৃতি হইতে ক্রমোন্নতিবলে বাঙ্গালা কবিতা এরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছে। হাড়াই পণ্ডিত-প্রণীত ধর্ম্মের মাহাত্ম্য-প্রকাশক "শূন্য পুরাণ"ই বোধ হয় প্রথম বাঙ্গালা কাব্য।

ধর্ম্মপ্রাণ…মন্দিরে—প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের কাব্য প্রায়ই কোন না কোন দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য রচিত হইত, এবং চামর মন্দিরাদি সহযোগে গীত হইত।

(৩) দেবভাষা—সংস্কৃত ; সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত, প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি। কাশীরাম প্রভৃতি কবিগণ বাঙ্গালা ভাষাকেও প্রাকৃত বলিয়াছেন ; প্রাকৃত—সাধারণ লোকের ব্যবহৃত ভাষা। বিদগ্ধ—পণ্ডিত।

(৪) মিথিলা—বর্ত্তমান ত্রিহুত। ছুটিল…লহরী—মৈথিল কবি বিদ্যাপতি

বাশুলীর পূজা করি', করি' সঙ্কীর্ত্তন,
ভ্রমিত 'পাগল' কবি, ভাবে ভরপুর ; •
বাণী-বক্ষে শোভে তাঁর কৌস্তুভ-রতন ;
সাহিত্যের মহাতীর্থ পবিত্র নান্নুর। ৫

কৃত্তিবাস

স্বর্গীয় আশ্রমে তাঁর, তমসার তীরে,
গাহিলেন কবিগুরু যে দিব্য সঙ্গীত ;
ফুলিয়ায় কৃত্তিবাস ওঝার কুটীরে,
তারই প্রতিধ্বনি বঙ্গে করিল মোহিত। ৬

কাশীরাম দাস

গম্ভীর জীমূত-মন্দ্রে ভারতের কথা,
তপঃশুদ্ধবুদ্ধি ঋষি গাহিলেন ব্যাস ;
দূর শিঙ্গীগ্রামে তার অপূর্ব্ব বারতা,
শুনাইল বাঙ্গালীরে কাশীরাম দাস। ৭

চণ্ডীদাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন (ইহার বিবরণ চণ্ডীদাসের জীবনীতে দেখ)।

(৫) কৌস্তুভ—বিষ্ণুবক্ষঃস্থ মণিবিশেষ।

(৬) তমসা—বর্ত্তমান গড়বাল দেশের অন্তর্গত নদীবিশেষ। ইহার তটস্থিত অরণ্যে কবিগুরু মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রম ছিল। ফুলিয়া—নদীয়া জেলার অন্তর্গত গ্রাম, কৃত্তিবাসের জন্মভূমি। ওঝা—উপাধ্যায় শব্দের অপভ্রংশ।

(৭) জীমূতমন্দ্র—মেঘধ্বনি। তপঃশুদ্ধবুদ্ধি—তপস্যার দ্বারা শুদ্ধ (নির্ম্মল) হইয়াছে বুদ্ধি যাঁর। শিঙ্গীগ্রাম—কাশীরাম দাসের জন্মভূমি, বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত।

বৃন্দাবনদাস

পাণ্ডিত্যের মল্লভূমি নবদ্বীপ-ধামে,
ভক্তিহীন যুক্তিশাস্ত্র করে আস্ফালন ;
ভক্তিরসে সরস করিতে শুষ্ক জ্ঞানে,
ধরায় গৌরচন্দ্র লভিলা জনম। ৮

নদীয়া-চাঁদের সেই অপূর্ব্ব চরিত,
গাহিলেন ভক্ত কবি বৃন্দাবনদাস ;
বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস রচি' 'চরিত-অমৃত',
মিটাইলা বাঙ্গালীর অতৃপ্ত পিয়াস। ৯

কবিকঙ্কণ

অত্যাচার-প্রপীড়িত দরিদ্র ব্রাহ্মণ,
লভিলা চণ্ডীর বর তীব্র তপস্যায় ;
"শ্রীচণ্ডীমঙ্গল"-কবি শ্রীকবিকঙ্কণ,
বঙ্গ-কাব্যাকাশে দীপ্ত অপূর্ব্ব প্রভায়। ১০

(৮) পাণ্ডিত্যের মল্লভূমি—নবদ্বীপ এককালে সংস্কৃত চর্চ্চার জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল। পরস্পর জিগীষার বশবর্ত্তী হইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্রবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করিতেন। তাঁহাদিগের তর্ক-কোলাহলে নবদ্বীপ সর্ব্বদা মুখরিত থাকিত।

(৯) নদীয়াচাঁদ—চৈতন্যদেবকে লোকে নবদ্বীপ-চন্দ্র বলিত।

(১০) কবিকঙ্কণের জীবনচরিত দেখ।

রামপ্রসাদ

হালিসহরের কবি শ্রীরামপ্রসাদ,
বিলাইলা মাতৃনাম-সুধা বঙ্গদেশে ;
বাঙ্গালী লভিয়া সেই অমৃত-আস্বাদ,
করাল কালের ভয় উড়াইল হেসে। ১১

ভারতচন্দ্র

উপেক্ষিয়া লক্ষ্মীর কটাক্ষ, গুণাকর
লভিলা অপার শান্তি বাণী-আরাধনে ;
দেব-ভাষা বঙ্গভাষা দোঁহে পরস্পর,
"অন্নদা-মঙ্গলে" বাঁধা প্রেম-আলিঙ্গনে। ১২

স্বাস্থ্য-তৃপ্তি-প্রীতি-হাস্য-কৌতুক-উজ্জ্বল,
চিত্রিত হইত কাব্যে বাঙ্গালী-জীবন ;
কামনা করিয়া নিত্য পল্লীর মঙ্গল,
পল্লীবাসী ভক্তিভরে করিত কীর্ত্তন। ১৩

(১১) রামপ্রসাদের কালী-বিষয়ক পদাবলী ভক্ত ও ভাবুকের পরম আদরের সামগ্রী।

(১২) কটাক্ষ—বক্র বা প্রতিকূল দৃষ্টি। গুণাকর—"অন্নদা-মঙ্গল"-রচয়িতা কবি ভারতচন্দ্র রায়ের উপাধি 'গুণাকর' ছিল। দেবভাষা ......আলিঙ্গনে—"অন্নদামঙ্গলে" সাধুভাষা ও চলিতভাষার সুন্দর সংমিশ্রণে এক অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে।

(যুগসন্ধি)

ঈশ্বর

প্রাচীন ও নবীনের যুগ-সন্ধি-স্থলে,
উদিলা সাহিত্যাকাশে গুপ্ত প্রভাকর ;
রঙ্গ ব্যঙ্গ সনে যাঁর হৃদয়ে উথলে,
মাতৃভাষা-মাতৃভূমি-প্রেম নিরন্তর। ১৪

রঙ্গলাল

ত্যজি' পৌরাণিক পথ, 'পদ্মিনী'র কবি,
চলিলেন বীরভূমি রাজপুতনায় ;
ফুটিল তূলিকামুখে স্বভাবের ছবি,
মোহিত হইল বঙ্গ বীরত্ব-গাথায়। ১৫

(নবীন যুগ)

পাশ্চাত্য-সাহিত্য, নিজ রত্নের ভাণ্ডার
সহসা সম্মুখে দিল করি' উদ্‌ঘাটিত ;
অপূর্ব্ব বিভবরাশি হেরিয়া তাহার,
হইল বাঙ্গালী যুবা বিস্মিত, মোহিত। ১৬

---

(১৪) যুগ-সন্ধি-স্থলে—উভয় যুগের মিলনস্থলে। গুপ্ত প্রভাকর—"সংবাদ-প্রভাকর"-সম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

(১৫) 'পদ্মিনীর কবি'—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। রঙ্গলালের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা কবিই পুরাণাদি হইতে তাঁহাদিগের কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন ; রঙ্গলাল পুরাণ পরিত্যাগ করিয়া রাজস্থানের বীরত্ব-কাহিনী অবলম্বন পূর্ব্বক কাব্য রচনা করেন।

(১৬) পাশ্চাত্য সাহিত্য—য়ুরোপীয়, বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্য।

ভুলিল সে মাতৃভাষা, পেয়ে রাজরাণী,
লজ্জায়, ঘৃণায় কভু চাহিত না ফিরে ;
দরিদ্র 'কবি'র পূজা ল'য়ে পল্লী-বাণী,
রহিলেন বাঙ্গালার পল্লীর কুটীরে। ১৭

মাতৃসম মাতৃভাষা কে পারে ভুলিতে ?
ক্রমে যবে হ'ল স্বপ্ন-মোহ-অবসান,
হেরিল সন্তান মাতৃভাষার খনিতে,
নহে কাচ—কিন্তু মণি অমূল্য, মহান্। ১৮

মাইকেল মধুসূদন

প্রাচ্য-প্রতীচ্যের ভাব-সাগর মথিয়া,
অপূর্ব্ব কৌস্তুভরাজি করি আহরণ,
ভাষা-জননীর অঙ্গ সুখে সাজাইয়া,
লভিলা অতুল কীর্ত্তি শ্রীমধুসূদন। ১৯

(১৭) ইংরাজী শিক্ষার প্রথম প্রচলনের সময় হিন্দু কলেজের ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী ছাত্রগণ মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলিতেন, বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

'কবি'—ভোলা ময়রা, রামবসু প্রভৃতি কবিওয়ালাগণ।

(১৮) মাইকেল মধুসূদনের "বঙ্গভাষা" শীর্ষক কবিতা দেখ। মধুসূদন প্রথমাবস্থায় তাঁহার অন্যান্য সহপাঠীদিগের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষাকে অবজ্ঞা করিতেন।

হেমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র আত্মহারা ভারত-কথায় ;
ধর্ম্মরাজ্য-স্বপ্নে মুগ্ধ চট্টলের রবি ;
উদি' বঙ্গজননীর 'হৃদয়-রাকায়',
উদ্ভাসিত কৈলা দেশ শ্রীবঙ্কিম কবি। ২০

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্র অন্বর্থনামা, প্রাচ্য রাজকবি,
ব্যাপ্ত ভূমণ্ডল যাঁর কবিত্ব-প্রভায় ;
প্রতীচ্যের শ্রদ্ধাপূত জয়মাল্য লভি',
গৌরবিতা বঙ্গভাষা যাঁর সাধনায়। ২১

(২০) কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারত-বিলাপ' 'ভারত-ভিক্ষা' প্রভৃতি কবিতা লিখিয়াছিলেন। এই সমস্ত কবিতায় তাঁহার স্বদেশ-প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়।

চট্টলের রবি—চট্টগ্রামবাসী কবি নবীনচন্দ্র সেন। ভারতে ধর্ম্মরাজ্য-সংস্থাপয়িতা শ্রীকৃষ্ণের জীবনচরিত অবলম্বনে নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাস' কাব্যত্রয় রচিত।

হৃদয়-রাকায়—রাকা পূর্ণিমাতিথি ; লক্ষণায় পূর্ণিমার আকাশ। হেমচন্দ্র তাঁহার "কুহুস্বর" নামক কবিতায় বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বাঁকা চাঁদ আঁকা যার হৃদয়-রাকায়।"

(২১) অন্বর্থনামা—যাঁহার নাম সার্থক হইয়াছে ; অর্থাৎ যাঁহার নাম রবি এবং যাঁহার কবি-প্রতিভাও রবির ন্যায়ই উজ্জ্বল ; রবি-কিরণের ন্যায় ইহার প্রভায় সমগ্র পৃথিবী সমুজ্জ্বল হইয়াছে। প্রাচ্য রাজ-কবি—ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব রাজ-প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ রবীন্দ্রনাথকে "Laureate of the East" বলিয়াছিলেন।

কুটীর ত্যজিয়া আজ স্থবর্ণ দেউলে,
রত্নাসনে উপবিষ্ট বঙ্গের ভারতী ;
জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গর্ব্বমান ভুলে,
পূজিছে বাঙ্গালী তাঁর স্থবর্ণ-মুরতি। ২২

দীন মন্দমতি, তবু পূজিবারে সাধ,
ভূতলে অতুল ঐ রাতুল চরণ ;
ব্যর্থ আশা প্রাণে যবে আনে অবসাদ,
অভাগার একমাত্র তুমি, মা, শরণ। ২৩

তব ভক্তগণ-সাথে তোমার মন্দিরে,
পশিবার অভিমান নাহি, মা, আমার ;
যতকাল রবে প্রাণ এ ভগ্ন শরীরে,
করিতে মানস-পূজা দিও অধিকার। ২৪

(২২) দেউল—মন্দির (সংস্কৃত 'দেবকুল' শব্দ হইতে)।
(২৩) রাতুল—লাল (সংস্কৃত, 'রক্তালু' শব্দ হইতে)।

চণ্ডীদাস

বীরভূম জেলার অন্তঃপাতী নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার জন্ম হয়। চণ্ডীদাসের পিতা বাশুলী দেবীর পূজারি ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর চণ্ডীদাস সেই কার্য্য করিতেন। এখনও নান্নুর গ্রামে বাশুলী দেবীর মন্দির আছে ও তথায় তাঁহার নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

চণ্ডীদাস কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবিষয়ক অনেক পদ বা কবিতা রচনা করিয়া তাহা স্বয়ং এবং দলবল সহ কীর্ত্তন করিতেন। এই কৃষ্ণপ্রেমে পাগল কবিকে তাঁহার গ্রাম-বাসীরা 'চণ্ডে পাগলা' বলিয়া ডাকিত।

চণ্ডীদাসের স্থললিত পদাবলীর খ্যাতি, তাঁহার গ্রামের সীমা অতিক্রম করিয়া, অতি দূরদেশ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। কথিত আছে, মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদাবলী পাঠে মুগ্ধ হইয়া, মিথিলা হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া-ছিলেন। গঙ্গাতীরে পরস্পরের সাক্ষাৎ হয়। বিদ্যাপতিও কৃষ্ণ-প্রেম অবলম্বন করিয়া অনেক স্থমধুর পদাবলী রচনা করিয়াছেন। মৈথিলশব্দবহুল হইলেও বিদ্যাপতির পদাবলী বঙ্গীয় পাঠকের হৃদয় মুগ্ধ করে। এইজন্য অনেকে বিদ্যাপতিকেও বঙ্গভাষার কবি বলিয়া থাকেন।

কথিত আছে যে, চণ্ডীদাস একদিন দলবলসহ বাশুলী-দেবীর

নাট্মন্দিরে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এমন সময় মন্দিরের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়ে। ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে প্রোথিত হইয়া কবি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে অন্যান্য কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে।

চণ্ডীদাসের অনেক পদাবলীর ভাব অতি গভীর। ভগবান্‌কে পাইবার জন্য রাধার প্রাণের ব্যাকুলতা, আপনার বলিতে কিছু না রাখিয়া ভগবানের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ,—এই সমস্ত অতি মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় চণ্ডীদাসের পদাবলীতে বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাষা অতি সরল। যদি মধ্যে মধ্যে কতকগুলি গ্রামজ শব্দ না থাকিত, তাঁহা হইলে আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার সহিত উহার বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হইত না।

চণ্ডীদাসের পদাবলী ধানসী, কামোদ প্রভৃতি কতকগুলি রাগরাগিণী সহযোগে গীত হইত। এই সমস্ত রাগরাগিণী এখন বড় প্রচলিত নাই। গানের ছন্দে রচিত বলিয়া পদাবলীতে অনেক স্থলে সাধারণ কবিতার ছন্দের নিয়ম প্রতিপালিত হয় নাই। ছন্দে সকল স্থলে অক্ষরের সংখ্যার সমতা নাই।

হতাশের আক্ষেপ

[রাধা কৃষ্ণপ্রেমে হতাশ হইয়া
আক্ষেপ করিতেছেন।]

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
আগুনে পুড়িয়া গেল।
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥
হায়, কি মোর কপালে লেখি।
শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিনু
ভানুর কিরণ দেখি॥
উচল বলিয়া অচলে চড়িনু
পড়িনু অগাধ জলে।
লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল
মাণিক হারানু হেলে॥

অমিয়া—অমৃত। সিনান—স্নান। ভেল—হইল। লেখি—লেখা। উচল—উচ্চ। অচল—পর্ব্বত। লছমী—লক্ষ্মী; ধন। বেড়ল—ঘেরিল। হেলে—অবহেলায়।

নগর বসানু সাগর বাঁধিনু
মাণিক্ পাবার আশে।
সাগর শুকাল মাণিক লুকাল
অভাগী-করম-দোষে ॥
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিনু
বজর পড়িয়া গেল।
কহে চণ্ডীদাস শ্যামের পীরিতি
মরমে রহিল শেল ॥

অভাগী-করম-দোষে—হতভাগিনীর কর্ম্মের ফলে। পিয়াস—তৃষ্ণা। বজর—বজ্র। পীরিতি—প্রীতি শব্দের অপভ্রংশ; প্রণয়, স্নেহ। শ্যামের পীরিতি ......শেল—কৃষ্ণের প্রেম আমার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া রহিল; ইহাতে আমি অত্যন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি।

কৃত্তিবাস

নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামে কৃত্তিবাসের জন্ম হয়। রাণাঘাট ষ্টেশন হইতে ফুলিয়া প্রায় সাত মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন।

কৃত্তিবাস মুখটিবংশসম্ভূত। তিনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার আত্মচরিত হইতে জানা যায় যে, বিদ্যা-সমাপনান্তে, তিনি, রাজপণ্ডিত হইবার আশায়, পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া গৌড়েশ্বরের সভায় গমন করেন। তাঁহার কবি-শক্তিতে প্রীত হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতে চাহিলেন। কৃত্তিবাস গর্ব্বভরে বলিলেন—

"কারো কিছু নাহি লই, করি পরিহার। *
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥"

তখন রাজা প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে রচিত। তাহা হইলেও উভয় গ্রন্থে স্থানে স্থানে বিলক্ষণ প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

---

* করি পরিহার—দান প্রত্যাখ্যান করি।

প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগুলি উৎসবাদি উপলক্ষে গীত হইত। এখনও অনেকে স্বর করিয়া রামায়ণ মহাভারতাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। গীত হইত বলিয়া কবিগণ ছন্দের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। অক্ষরের সংখ্যার প্রায়ই ন্যূনাধিক্য ঘটিত। অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থের ন্যায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণ প্রধানতঃ পয়ার ছন্দেই রচিত, স্থানে স্থানে ত্রিপদী প্রভৃতি অন্য ছন্দও আছে।

তখনও কাব্যের একটি সার্ব্বজনীন ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। এজন্য অনেক কবির গ্রন্থে বিস্তর গ্রামজ শব্দ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ কারণে ঐ সমস্ত গ্রন্থ আধুনিক সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের সহজবোধ্য ও প্রীতিকর নহে। এখন আমরা যে কৃত্তিবাসের রামায়ণ দেখিতে পাই, তাহা কৃত্তিবাসের মূল রচনা নহে, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সংশোধিত সংস্করণ। তাহা হইলেও পণ্ডিতগণ কৃত্তিবাসের মূলই অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম

[যখন পিতৃ-সত্য-পালনার্থ শ্রীরামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত, বনগমন করেন, তখন ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। অযোধ্যা হইতে দূত গিয়া ভরতকে লইয়া আসিল। দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরাম প্রভৃতির বনগমনের কথা দূত ভরতকে বলে নাই। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া এই সকল বিষয় অবগত হইয়া, ভরত নিজ জননী কৈকেয়ীকে এই সমস্ত ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।]

কেকয়ী সকল কহে ভরতের স্থানে।
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে ॥—
"ভকত-বৎসল রাম ধর্ম্মেতে তৎপর।
জনক-জননী-প্রাণ, গুণের সাগর ॥
শ্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক।
রামের প্রসাদে লোক পায় নানা সুখ ॥

বাখানে—বর্ণনা করেন। ভকতবৎসল—ভক্তের প্রতি স্নেহশীল। জনক-জননী-প্রাণ—মাতাপিতার জীবনস্বরূপ। কৌতুক—আনন্দ।

কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস।
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস॥
তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন।
হা রাম! বলিয়া রাজা ত্যজিল জীবন॥
মাতৃ-ধার পুত্রে কভু শুধিতে না পারে।
রাম ল'য়েছিল রাজ্য, দিলাম তোমারে॥
রাজা হ'য়ে রাজ্য কর বৈস রাজপাটে।
রাজলক্ষ্মী আছে, পুত্র, তোমার ললাটে॥

আঘাত লাগিলে ঘায়ে জ্বলে তা যেমন।
তেমতি ভরত বলে হ'য়ে জ্বালাতন॥—
"রাজকুলে জন্মিয়া, শুনিলে কোন্ খানে।
কনিষ্ঠ হইবে রাজা জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে?
শ্রীরামের শোকে রাজা ত্যজেন জীবন।
তুমি কেন শ্রীরামের ঘটাইলে বন?
রাজার প্রসাদে তব এতেক সম্পদ।
তিন কুল মজাইলে স্বামী করি' বধ॥"

ভরত জ্বলন্ত অগ্নিতুল্য ক্রোধে জ্বলে।
দেখিয়া কেকয়ী তবে যায় অন্য স্থলে॥

অধিবাস—পূজা বা কোন শুভকার্য্যের পূর্ব্বদিনে সম্পাদিত ধর্ম্মকার্য্যবিশেষ।
জপাট—রাজপট্ট শব্দের অপভ্রংশ, রাজ-সিংহাসন।

যাইতে যাইতে রাণী করিছে বিষাদ।
কার লাগি করিলাম এতেক প্রমাদ ॥

শ্রীরামকে আনিতে ভরতের বনগমন

শ্রীরাম লক্ষ্মণ আর জনকের বালা।
বসতি করেন নির্ম্মাইয়া পর্ণশালা ॥
তার দ্বারে বসিয়া আছেন রঘুবীর।
জানকী তাহার মধ্যে, লক্ষ্মণ বাহির ॥
হেন কালে ভরত শত্রুঘ্ন দীনবেশ।
করিলেন শ্রীরামের আশ্রমে প্রবেশ ॥
গলবস্ত্র ভরত, নয়নে বহে নীর।
পথ-পর্য্যটনে অতি মলিন-শরীর ॥
পড়িলেন শ্রীরামের চরণ-কমলে।
আদরে শ্রীরাম তাঁরে লইলেন কোলে ॥
ভরত কহেন ধরি' রামের চরণ।—
"কার বাক্যে রাজ্য ছাড়ি বনে আগমন?
অপরাধ ক্ষমা কর, চল, ভাই, দেশ।
সিংহাসনে বসিয়া ঘুচাও মম ক্লেশ ॥

প্রমাদ—ভুল, অনর্থ।

অযোধ্যা-ভূষণ তুমি, অযোধ্যার সার।
তোমা বিনা অযোধ্যা দিবসে অন্ধকার॥
চল, প্রভু, অযোধ্যায়, লহ রাজ্যভার।
দাসবৎ কর্ম্ম করি আজ্ঞা-অনুসার॥”
শ্রীরাম বলেন—“তুমি পরম পণ্ডিত।
না বুঝিয়া কেন বল হেন অনুচিত॥
চতুর্দ্দশ বৎসর পালিয়া পিতৃবাক্য।
অযোধ্যা যাইব আমি দেখিবে প্রত্যক্ষ॥
থাকুক সে সব কথা শুনিব সকল।
বলহ, ভরত, আগে পিতার কুশল॥”
বশিষ্ঠ বলেন—“রাম, না কহিলে নয়।
স্বর্গবাসে গিয়াছেন রাজা মহাশয়॥”
শুনি মূর্চ্ছাগত রাম জানকী লক্ষ্মণ।
ভূমিতে লুটিয়া বহু করেন ক্রন্দন॥
বশিষ্ঠ বলেন—“শোক ত্যজ মহামতি।
তোমা বুঝাইতে পারে, আছে কোন্ কৃতী
সত্যহেতু ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
রোদন করিয়া কেন পুণ্য কর নাশ?”
পিতৃশ্রাদ্ধ করে রাম ফল্গু-নদী-তীরে।
পিতৃপিণ্ড সমর্পণ করেন সে নীরে॥

বশিষ্ঠ—মহর্ষি, অযোধ্যার রাজবংশের কুলপুরোহিত। কৃতী—পণ্ডিত।

শ্রীরামেরে বলেন বশিষ্ঠ মহাশয়।—
"ভরতের প্রতি, রাম, কি অনুজ্ঞা হয়?"
শ্রীরাম বলেন—"মুনি, হইলাম সুখী।
প্রাণের অধিক আমি ভরতেরে দেখি॥
যাও, ভাই ভরত, ত্বরিত অযোধ্যায়।
মন্ত্রিগণ ল'য়ে রাজ্য করহ তথায়॥"
যোড়হাতে ভরত বলেন সবিনয়।—
"কেমনে রাখিব রাজ্য, মম কার্য্য নয়॥
তোমার পাদুকা দেহ করি নিয়া রাজা।
তবে সে পারিব আমি পালিবারে প্রজা॥"
শ্রীরাম বলেন—"হে ভরত, প্রাণাধিক।
পাদুকা লইয়া যাও, কি কব অধিক॥"
শ্রীরামের পাদুকা ভরত শিরে ধরে।
ভাবে পুলকিত অঙ্গ প্রফুল্ল অন্তরে॥
পাদুকার অভিষেক করিয়া তথায়।
চলিলেন ভরত শ্রীরামের আজ্ঞায়॥

পুলকিত—রোমাঞ্চিত। পুলক শব্দের অর্থ রোমাঞ্চ; মনে সহসা ভয়, বিস্ময়, হর্ষপ্রভৃতির উদয় হইলে রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় প্রধানতঃ হর্ষের ভাবই ধরিয়া পুলকিত শব্দের অর্থ 'আনন্দিত' করা হয়।

অভিষেক—স্নান; প্রথম রাজা হইবার সময় নৃপতিকে মন্ত্রপূত জলের দ্বারা স্নান করান হয়।

সীতাহরণে রামের বিলাপ

[রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা যখন পঞ্চবটী বনে বাস করিতে-ছিলেন, সেই সময় একদিন, লঙ্কার রাক্ষসরাজ রাবণের আদেশে, মারীচ নামে এক রাক্ষস স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের কুটীরের সম্মুখে ক্রীড়া করিতে থাকে। সীতার অভিলাষ পূরণার্থ রামচন্দ্র ঐ হরিণ ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইলেন। কিছুকাল পরে, দূরে রামচন্দ্রের করুণ-চীৎকারের ন্যায় শব্দ শুনিয়া, লক্ষ্মণ তাঁহার সাহায্যার্থ কুটীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সেই অবসরে রাবণ, ব্রাহ্মণ অতিথির বেশে আসিয়া, সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যায়। কুটীরে প্রত্যাগমন করিয়া, বহু অনুসন্ধানেও সীতাকে না পাইয়া, রামচন্দ্র বিলাপ করিতে লাগিলেন।]

বিলাপ করেন রাম লক্ষ্মণের আগে।—
"ভুলিতে না পারি সীতা সদা মনে জাগে॥
কি করিব, কোথা যাব, অনুজ লক্ষ্মণ।
কোথা গেলে সীতা পাব কর নিরূপণ॥
মন বুঝিবারে বুঝি আমার জানকী।
লুকাইয়া আছেন, লক্ষ্মণ, দেখদেখি॥

আগে—অগ্রে, সম্মুখে।

বুঝি কোন মুনি-পত্নী সহিত কোথায়।
গেলেন জানকী না জানাইয়া আমায়॥
গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া।
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া॥
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস।
চন্দ্রকলা-ভ্রমে রাহু করিল কি গ্রাস॥
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা।
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা॥
রাজ্যহীন যদ্যপি হয়েছি আমি বটে।
রাজলক্ষ্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে॥
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারাইল বনে।
কেকয়ীর মনোহভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে॥

গোদাবরী—দক্ষিণ ভারতের নদীবিশেষ। ইহারই তীরে পঞ্চবটী অবস্থিত ছিল। পদ্মালয়া—পদ্মবাসিনী লক্ষ্মী।

চিরদিন পিপাসিত ..গ্রাস—রাহু বহুকাল ধরিয়া পিপাসিত ছিল; আজ চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী সীতাকে দেখিয়া, পিপাসা নিবারণের চেষ্টায়, তাঁহাকে চন্দ্রকলা ভুল করিয়া গ্রাস করিল কি? কলা—চন্দ্রের ষোড়শাংস। "চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাসবৃদ্ধি তায়। কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥" অন্নদামঙ্গল। চৌষট্টি কলার অর্থ কি?

সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে।
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে॥
কনকলতার প্রায় জনক-দুহিতা।
বনে ছিল, কে করিল তারে উৎপাটিতা॥
দিবাবর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ।
দিবানিশা করিতেছে তমঃ নিবারণ॥
তারা না হরিতে পারে তিমির আমার।
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার॥
দেখরে, লক্ষ্মণ ভাই, কর অন্বেষণ।
সীতারে আনিয়া দেহ বাঁচাও জীবন॥
আমি জানি পঞ্চবটী অতি পুণ্যস্থান।
তেঁই সে এখানে করিলাম অবস্থান॥
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে।
শূন্য দেখি তপোবন সীতা নাই ঘরে॥
শুন পশু মৃগ পক্ষী বন বৃক্ষ লতা।
কে হরিল আমার সে চন্দ্রমুখী সীতা॥"

সৌদামিনী—বিদ্যুৎ। কনকলতা—স্বর্ণলতা।
তমঃ—অন্ধকার। তমস্ শব্দ। তমঃ-নিবারণ, কি সন্ধি হইতে পারে?

পঞ্চবটী—বিশাল দণ্ডকারণ্যের একটী অংশ। এইস্থান হইতে গোদাবরী নদী উত্থিত হইয়াছে। বনবাসকালে রামচন্দ্র এখানে বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বর্ত্তমান নাসিক নগর হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। অনেকে বলেন, লক্ষ্মণ এই স্থানে শূর্পণখার নাসিকা কাটিয়াছিলেন বলিয়া "নাসিকের" ঐরূপ নাম হইয়াছে।

লব কুশের রামায়ণ গান

[যুদ্ধে রাবণকে সবংশে নিধন করিয়া, চতুর্দ্দশ বর্ষের অবসানে, রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া, সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রজারঞ্জনই জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন। একদিন রামচন্দ্র দূতমুখে অবগত হইলেন যে, প্রজাগণ সীতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছে, কারণ সীতা দীর্ঘকাল দুর্ব্বৃত্ত রাবণের রাজধানীতে বন্দিনী ছিলেন। সীতার উদ্ধারের অব্যবহিত পরেই লঙ্কায় তাঁহার অগ্নি-পরীক্ষা হইয়াছিল। সমস্ত দেবগণ আসিয়া সীতাকে নিষ্কলঙ্ক বলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু অযোধ্যার প্রজাগণ, চক্ষে দেখে নাই বলিয়া, সে ঘটনা বিশ্বাস করিল না।

সীতাকে নিষ্পাপ জানিয়াও, প্রজাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য, রামচন্দ্র তাঁহাকে বনে প্রেরণ করিলেন। সীতা তখন পূর্ণগর্ভা। মহর্ষি বাল্মীকি তাঁহাকে আপন আশ্রমে আনিয়া কন্যার মত পালন করিতে লাগিলেন। সেই আশ্রমে লব ও কুশ নামে সীতার দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহারা বড় হইলে, বাল্মীকি, রামের চরিত্র অবলম্বনে রামায়ণ নামক মহাকাব্য রচনা করিয়া, তাহা গান করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেন।

ক্রমে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। সেই যজ্ঞে

নানাদেশ হইতে লোকদিগের সমাগম হইল। মহর্ষি বাল্মীকিও নিমন্ত্রিত হইয়া লব ও কুশ সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। বাল্মীকি, লব ও কুশকে রামের নিকট পরিচিত করাইবার উদ্দেশ্যে, তাহাদিগকে সেখানে রামায়ণ গান করিতে আদেশ করিলেন।]

বিভাবরী প্রভাত, উদিত ভানুমান্।
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান॥
শিরে জটা বান্ধিলেন দেখিতে সুঠাম।
পূর্ণচন্দ্র মুখ, বর্ণ দূর্ব্বাদল-শ্যাম॥
হাতে বীণা করি দোঁহে করেন গমন।
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ রামায়ণ॥
হাটে মাঠে গীত গান নগরে বাজারে।
শুনিয়া সুস্বর সবে আপনা পাসরে॥
কহিল অমাত্যগণ রামেরে ত্বরিত।
শিশুমুখে মিষ্ট গান শুনিতে উচিত॥
অমাত্যের প্রতি রাম করেন আদেশ।
যজ্ঞস্থানে দুই ভাই করেন প্রবেশ॥

ভানুমান্—[ভানু (কিরণ)+মৎ) সূর্য্য। বেদ রামায়ণ—অলৌকিক তেজঃসম্পন্ন মহর্ষির রচিত, পরম পবিত্র ও জ্ঞানগর্ভ বলিয়া রামায়ণকে বেদ বলা হইয়াছে। মহাভারতকেও পঞ্চম বেদ বলা হয়।

পাসরে—ভুলিয়া যায়।

বীণা হাতে করিয়া বসিল সে সভায়।
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক ধায়॥
অবসর পাইয়া যজ্ঞের অবশেষে।
বসিলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধবেশে॥
স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-নিবাসী যতজন।
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ॥
বসিল পণ্ডিতগণ জ্ঞানেতে পূরিত।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ চারিভিত॥
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়া বীণা।
সর্ব্বলোকে গীত শুনে অমৃতের কণা॥
চারি ভাই রঘুনাথ গীতে দেন মন।
মোহিত হইল লোক শুনি রামায়ণ॥
সর্ব্বলোকে সভায় করিছে কাণাকাণি।
রামের আকৃতি দুই শিশু কে না জানি
জটা আর বাকল এই যে মাত্র আন।
আকৃতি প্রকৃতি দেখি রামের সমান॥
কোন্ বিধি নির্ম্মাণ করিল দুইজনে।
এত গুণ ধরে কোথা আছে ত্রিভুবনে॥
যতেক সভার লোক অনুমান করে।
রামের এ দুই পুত্র কভু নাহি নড়ে॥

কাণাকাণি—সংস্কৃত কর্ণাকর্ণি শব্দ হইতে ; কাণে কাণে বলা। আন—অন্য শব্দের অপভ্রংশ ; প্রভেদ। নড়ে—অন্যথা হয়।

দুই ভাই গীত যদি কৈল অবসান।
শ্রীরাম বলেন—রাখ গায়কের মান ॥
শুনিলেন লক্ষ্মণ শ্রীরামের বচন।
অশীতি সহস্র তোলা আনেন কাঞ্চন ॥
গায়কেরে দিলেন পূরিয়া স্বর্ণথালা।
পীতাম্বর অলঙ্কার আর পুষ্পমালা ॥
উভয় গায়ক বলে—শ্রীরঘুনন্দন।
বস্ত্র-অলঙ্কারে কিছু নাহি প্রয়োজন ॥
কি করিবে ধনে বস্ত্রে আর অলঙ্কারে।
বস্ত্র অলঙ্কার রাখ আপন ভাণ্ডারে ॥

সীতার পাতাল-প্রবেশ

একমাসে গীত যদি হইল বিরাম।
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোঁহারে শ্রীরাম ॥—
"আমি তোমা দোঁহাকে জিজ্ঞাসি বিবরণ
কোন্ বংশে জন্মিলা বা কাহার নন্দন ॥"
লব-কুশ তখন শ্রীরামের সাক্ষাতে।
ছলে পরিচয় করে দোঁহে হেঁটমাথে ॥—
"না জানি পিতার নাম মাতৃনাম সীতা।

পীতাম্বর—হরিদ্রা রঙের কাপড়।

বাল্মীকির শিষ্য মোরা নাহি চিনি পিতা ॥
এই পরিচয় লও শ্রীরঘুনন্দন।"
দুই পুত্র কোলে করি রামের ক্রন্দন ॥
শ্রীরাম বলেন—"হে বাল্মীকি, জ্ঞানবান্।
জান ভূত ভবিষ্যৎ আর বর্ত্তমান ॥
এতেক জানিয়া তুমি কহ না আমারে।
পরীক্ষা লইয়া সীতা আনি নিজ ঘরে ॥"

মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া।
স্বদেশে গেলেন মুনি সুমন্ত্রে লইয়া ॥
মুনির চরণে সীতা করি' নমস্কার।
জিজ্ঞাসা করেন—"মুনি, কহ সারোদ্ধার ॥
পিতা-পুত্রে কেমনে হইল পরিচয়।"
সে সব কহেন মুনি সীতার আলয় ॥—
"শুনহ আমার বাক্য জনক-দুহিতে।
পূর্ব্বের নির্ব্বন্ধ কেহ না পারে খণ্ডিতে ॥
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন।
পরীক্ষা দেখিতে তব আইল দেবগণ ॥

সুমন্ত্র—শ্রীরামচন্দ্রের সারথি। সারোদ্ধার—সারমর্ম্ম। আলয়—নিকটে জনক-দুহিতে—মিলের অনুরোধে 'দুহিতে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ; অথবা বাঙ্গালায় 'দুহিতা' শব্দের সম্বোধনের একবচন। নির্ব্বন্ধ—বিধান।

প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদিত।
আরবার পরীক্ষা যে ললাটে লিখিত ॥"
জানকীরে কহিলেন এই মত মুনি।
সীতার নয়নে জল ঝরিল তখনি ॥
রথেতে চড়িয়া সীতা করিল গমন।
বাল্মীকির তপোবনে উঠিল ক্রন্দন ॥

জগতের যতলোক অযোধ্যা-নগরে।
হেনকালে সীতা গেল সভার ভিতরে ॥
ভূমিতে আছেন সীতা রথ হইতে উলি।
রূপে পুরী আলো করে ঢাকিছে বিজুলী ॥
রামের চরণ সীতা করিল বন্দন।
বাল্মীকি রামের প্রতি কহেন তখন ॥—
"চ্যবনের পুত্র যে বাল্মীকি নাম ধরি।
মন দিয়া শুন, রাম, নিবেদন করি ॥
বহু তপ করিলাম ত্যজি' ভক্ষ্য পানি।
সীতার শরীরে পাপ নাহি আমি জানি ॥
পাপমতি নহে সীতা পরম পবিত্র।
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতার চরিত্র ॥

উলি—অবতরণ করিয়া। বিজুলী—বিদ্যুৎ। ঢাকিছে বিজুলী—সীতার রূপে বিদ্যুৎও যেন ঢাকা পড়িয়াছে। পানি—জল।

ঘরে লহ সীতারে কি করহ বিচার।
লব কুশ দুই পুত্র তোমার কুমার॥"
মুনি প্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে।—
"সীতার চরিত্র আমি জানি ভালমতে॥
অগ্নিশুদ্ধা হইলেন দেব-বিদ্যমানে।
জানকীরে দেশে আনিলাম সেকারণে॥
আমি জানি সীতার শরীরে নাহি পাপ।
বিধির নির্ব্বন্ধ এই ঘটিল সন্তাপ॥
আর কিছু মহামুনি, না বলিহ মোরে।
সীতার পরীক্ষা দিন সভার ভিতরে॥"
শ্রীরাম বলেন—"সীতা, শুনহ বচন।
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্ব্বজন॥
প্রথম পরীক্ষা দিলা সাগরের পার।
দেবগণ জানে তাহা না জানে সংসার॥
পুনশ্চ পরীক্ষা দিবে সবাকার আগে।
দেখিয়া লোকের যেন চমৎকার লাগে॥"
এত যদি বলিলেন শ্রীরাম সীতারে।
যোড়হাতে জানকী বলেন শ্রীরামেরে॥—
"কি কার্য্য আমার, রঘুনাথ, এ জীবনে।
প্রবেশ করিব অগ্নি তোমার বচনে॥
পরীক্ষা দিলাম পূর্ব্বে দেব-বিদ্যমানে।
দেবেরা বলিল যাহা শুনিলে আপনে॥

দেশেতে আনিলা তুমি দিয়া যে আশ্বাস।
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলে বনবাস ॥
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি।
ফলমূল খাই কভু, কভু উপবাসী ॥
পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান।
অগ্নিতে পরীক্ষা নিয়া কর অপমান ॥
সর্ব্বগুণ ধর তুমি, বিচারে পণ্ডিত।
বুঝিয়া পরীক্ষা নিতে হয়ত উচিত ॥
অদেখা হইব, প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল।
সংসারের সাধ নাহি, যাইব পাতাল ॥
আজি হৈতে তোমার ঘুচুক লাজ দুঃখ।
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥
জন্মে জন্মে, প্রভু, মোর তুমি হইও পতি।
আর কোন জন্মে মোর না কর দুর্গতি ॥"

জানকীর বচন শুনিল সর্ব্বলোকে।
লজ্জায় কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে ॥—
"মা হইয়া, পৃথিবী, মায়ের কর কাজ।
কন্যার হইলে লজ্জা তোমার সে লাজ ॥

মহাদেবী......বসি—আমি রাজমহিষী হইয়াও অরণ্যে মুনির কুটীরে বাস করি। অদেখা হইব—আর তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না। মা হইয়া পৃথিবী—রাজর্ষি জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলে তাঁহার লাঙ্গলের সীতার অর্থাৎ

কত দুঃখ সহে, মাগো, আমার পরাণে।
সেবা করি থাকি সদা তোমার চরণে॥
উদরে ধরিলা, মাগো, তাকি মনে নাই।
তোমার চরণে সীতা কিছু মাগে ঠাঁই।"
করিলেন সীতা পৃথিবীরে এই স্তুতি।
সপ্ত পাতাল থাকিয়া শুনেন বসুমতী॥
সীতা নিতে পৃথিবী করিল আগুসার।
সপ্ত পাতাল হইতে হইল এক দ্বার॥
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণ-সিংহাসন।
দশদিক্ আলো করে অযোধ্যাভুবন॥
নানাবিধ বসন-ভূষণ-পরিধান।
মূর্ত্তিমতী পৃথিবী রহিল বিদ্যমান॥
ঝি বলিয়া সীতারে পৃথিবী ডাকে ঘনে।
কোলে করি সীতারে তুলিল সিংহাসনে॥
"পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায়।
লোক ল'য়ে সুখে থাকুন শ্রীরাম হেথায়॥

ফালের মুখে সীতা উঠিয়াছিলেন। এইজন্য সীতা নাম হইয়াছে এবং এইজন্য সীতাকে পৃথিবীর কন্যা বলা হয়।

সপ্ত পাতাল—পাতাল সাতটি বলিয়া কল্পিত, যথা—অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। স্বর্গও সাতটি—কি কি? আগুসার—অগ্রসর। ঝি—মেয়ে।

মায়ে ঝিয়ে দুইজনে থাকিব পাতালে।"
সর্ব্বলোক শুনিল পৃথিবী যত বলে॥
নাহি চাহিলেন সীতা উভয় ছাবালে।
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে॥
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল অনিবার।
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার॥

ছাবাল—ছাওয়াল, ছেলে।

বৃন্দাবনদাস

চৈতন্যদেব

চৈতন্যদেবের জন্ম বাঙ্গালার ইতিহাসে একটি অতি স্মরণীয় ঘটনা। চৈতন্যদেব একজন যুগপ্রবর্ত্তক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্রের আদি নিবাস শ্রীহট্টে ছিল। শ্রীহট্ট হইতে তিনি নবদ্বীপে অধ্যয়নার্থ আগমন করেন। পরে তথায় বিবাহ করিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পত্নীর নাম শচীদেবী।

জগন্নাথ মিশ্রের সাত কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কন্যা কয়টি শৈশবেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্র দুইটির মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ যোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

কনিষ্ঠ পুত্রটির নাম বিশ্বম্ভর। শচীদেবী ইঁহাকে নিমাই বলিয়া ডাকিতেন।

দরিদ্রের ঘরে জন্মিলেও নিমাই যথেষ্ট আদর-যত্নে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যে সকলেই মোহিত হইত। মাতাপিতা ও প্রতিবেশিগণের আদরে নিমাই বাল্যকালে অত্যন্ত চপল হইয়া উঠিলেন।

নিমাইয়ের অল্প বয়সেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন

নিমাইয়ের বাল-চাপল্য অনেকটা বিদূরিত হইল। তিনি গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পাঠে তাঁহার একাগ্রতা ও প্রতিভা দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইত। অল্প-দিনের মধ্যেই তিনি স্বয়ং অধ্যাপক হইলেন ও এক চতুষ্পাঠী খুলিলেন। এই সময়ে কেশব কাশ্মীর নামে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে তিনি তর্কে পরাজিত করেন। তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়। এই সময়েই নিমাইয়ের বিবাহ হয়। তাঁহার পত্নীর নাম ছিল লক্ষ্মীদেবী।

নিমাই পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণে যাত্রা করিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট সমাদর হইল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে নবদ্বীপে প্রত্যা-গমন করিয়া তিনি শুনিলেন যে, সর্পাঘাতে তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যু হইয়াছে।

নিমাই প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। জননী শচীদেবীর বিলাপ তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। জননীর অনুরোধে তিনি পুনরায় দারপরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া।

সংসারের দারিদ্র্য, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্ন্যাস গ্রহণ, পিতার লোকান্তর, সর্পাঘাতে পত্নীর মৃত্যু—এই সমস্ত ঘটনায় নিমাইয়ের হৃদয়ে সংসার-বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি পিতৃপিণ্ড প্রদানের জন্য গয়াযাত্রা করিলেন। গয়ায় বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব প্রেমানন্দের উদয় হইল।

"অশ্রুধারা বহে দুই শ্রীপদ্মনয়নে।
লোমহর্ষ কম্প হৈল চরণ-দর্শনে॥"

সেইখানে ঈশ্বরপুরী নামে এক ভক্ত সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পূর্ব্বে নবদ্বীপেও তিনি তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন। ঈশ্বরপুরীর সংসর্গে নিমাইয়ের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। নিমাই পুরীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিলেন।

নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। কিন্তু সকলেই দেখিলেন—সে নিমাই আর নাই। সে ঔদ্ধত্য, অবিনয় দূর হইয়াছে, পাণ্ডিত্য-গর্ব্ব কোথায় তিরোহিত হইয়াছে; মুখে দিবারাত্র কৃষ্ণকথা। শচীদেবী ভীতা হইলেন।

নিমাই আর চতুষ্পাঠীতে বসেন না। ছাত্রগণের একান্ত অনুরোধে একদিন অধ্যাপনায় বসিলেন। ব্যাকরণ পড়াইতে বসিয়া তিনি সূত্র বৃত্তি টীকা সর্ব্বত্রই হরিনাম ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। ছাত্রেরা বিস্মিত হইল। নিমাই বলিলেন—

"কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি যে শাস্ত্র বাখানে।*
সে অধম কভু শাস্ত্রমর্ম্ম নাহি জানে॥"

মাতা আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, আজ কি পুঁথি পড়িলে? কাহার সঙ্গে কি কোন্দল করিয়া আসিলে?" নিমাই বলিলেন—

---

* বাখানে—ব্যাখ্যা করে।

"————আজি পড়িলাম কৃষ্ণনাম।
সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম॥
সেই শাস্ত্র সত্য কৃষ্ণ-ভক্তি কহে যা'য়।
অন্যথা হইলে, শাস্ত্র পাষণ্ডত্ব পায়॥
চণ্ডাল চণ্ডাল নহে—যদি কৃষ্ণ বলে।
বিপ্র নহে বিপ্র—যদি অসৎপথে চলে॥" *

একদিন পড়ুয়াগণ ভক্তিনম্রভাবে বলিল—"আপনি আজ শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের কর্ম্মদোষে আমাদিগের চিত্ত তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছে না।"

তখন নিমাই কাতরভাবে বলিলেন—

"তোমা সবাস্থানে মোর এই পরিহার। †
আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার॥
তোমা সবাকার যার স্থানে চিত্ত লয়।
তার ঠাঁই পড়, আমি দিলাম নির্ভয়॥

* সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল গুণধাম—সমস্ত গুণের আধারস্থান যে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম তাহাই একমাত্র সত্য।

† পরিহার—কাটান ছিড়ান, অর্থাৎ শেষ কথা।

পাষণ্ডত্ব—পাপ, হীনতা। যে শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তির কথা নাই, তাহা অতি হীন। চণ্ডাল চণ্ডাল নহে ইত্যাদি—ইহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল সূত্র বলা যাইতে পারে।

আর পাঠ নাহিক আমার—আমি আর তোমাদিগকে পাঠ দিতে অর্থাৎ পড়াইতে পারিব না।

কৃষ্ণ বিনা আর বাক্য না স্ফুরে আমার।
সত্য আমি কহিলাম চিত্ত আপনার॥"

এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিমাই জন্মের মত পুঁথি বাঁধিলেন। পড়ুয়ারাও কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

শচীদেবী অস্থির হইয়া উঠিলেন। তিনি দুঃখ করিয়া বলিতে লাগিলেন—

"বিধাতায়ে স্বামী নিল, নিল পুত্রগণ।
অবশিষ্ট সকলে আছয়ে এক জন॥
তাহারো কিরূপ মতি বুঝনে না যায়।
ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কাঁদে, ক্ষণে মূর্চ্ছা পায়॥" *

এই সময়ে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন বৈষ্ণব বাস করিতেন। নিমাই তাঁহাদিগের সহিত নাম সঙ্কীর্ত্তনে বিভোর হইয়া উঠিলেন। ক্রমে গৃহ-প্রাঙ্গণ ছাড়িয়া তাঁহারা পথে পথে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

তখন নবদ্বীপ ন্যায়াদি-শাস্ত্র-চর্চ্চায় দিবারাত্র মুখরিত থাকিত। জ্ঞানের উষর ক্ষেত্রে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। সঙ্কীর্ত্তনের কোলাহলে অধ্যয়ন অধ্যাপনার ও লোকের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হইতে লাগিল। পণ্ডিতেরা ক্রুদ্ধ হইলেন।

---

* বিধাতায়ে—বিধাতা। বাঙ্গালায় 'য়' 'য়ে' 'তে' প্রভৃতি কর্ত্তৃকারকের বিভক্তি; যেমন—ঘোড়ায় গাড়ী টানে; গরুতে ঘাস খায়। আজকাল 'য়ে' বিভক্তির তেমন প্রচলন নাই।

বুঝনে—বোঝা।

শেষে কাজী সাহেবের কাণে এই সমস্ত কথা পৌছিল। কাজী সাহেব ক্রুদ্ধ হইলেন ও সঙ্কীর্ত্তন বন্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতকার্য্য হইলেন না।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তিরস্কার-উৎপীড়ন সমস্ত সহ্য করিয়া, ভক্তগণ নামরসে সমস্ত নবদ্বীপ প্লাবিত করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই তাঁহাদের দলের পুষ্টি হইতে লাগিল। কয়েকজন অতি দুর্ব্বৃত্তও নবজীবন লাভ করিয়া পরম কৃষ্ণভক্ত হইয়া উঠিল।

একদিন নিমাই গৃহত্যাগ করিলেন। কাটোয়ায় গমন করিয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। ভারতী বলিলেন—

"যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য, কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল ধন্য॥" *

এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শচীদেবী মূর্চ্ছিতা হইলেন। দ্বাদশ দিবস তিনি অন্নজল গ্রহণ করেন নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের সময় চৈতন্যের বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র ছিল

বোলাইয়া—বলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—জ্ঞান দান করিলে।
এতেকে—এইজন্য।

সন্ন্যাসগ্রহণের পর চৈতন্যদেব জগন্নাথদর্শনার্থ নীলাচল গমন করেন। তিনি অষ্টাদশ বর্ষ কাল নীলাচলে অবস্থিতি করেন। দাক্ষিণাত্য, বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণে ছয় বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার দেহাবসান হয়।

চৈতন্যদেবের এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত অবলম্বন করিয়া অনেক কবি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বৃন্দাবনদাস-প্রণীত চৈতন্যভাগবত ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ-প্রণীত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতই সমধিক প্রসিদ্ধ।

চৈতন্যের সহচর শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্রী নারায়ণী দেবীর গর্ভে বৃন্দাবনদাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। চৈতন্যের দেহাবসানের কিছু পূর্ব্বেই তাঁহার জন্ম হয় এবং ঐ ঘটনার প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে চৈতন্য-ভাগবত রচিত হয়।

বৃন্দাবনদাস পরম চৈতন্যভক্ত ছিলেন। তিনি চৈতন্যদেবকে স্বয়ং কৃষ্ণাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সংস্কৃত শ্রীমদ্‌ভাগবতের অনুকরণে চৈতন্যভাগবত প্রণয়ন করেন।

"চৈতন্যভাগবত", ও "চৈতন্য-চরিতামৃত" ভিন্ন লোচনদাসের "চৈতন্যমঙ্গল", জয়ানন্দের "চৈতন্যমঙ্গল", গোবিন্দদাস, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতির 'কড়চা' ও সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

নিমাইয়ের বাল-চাপল্য

ধূলায় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লিখন-কালির বিন্দু শোভে মনোহর॥
পড়িয়া শুনিয়া সর্ব্ব-শিশুগণ-সঙ্গে।
গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহুরঙ্গে॥
মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বম্ভর কুতূহলী।
শিশুগণ সঙ্গে করে জল ফেলাফেলি॥
নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে।
অসংখ্যাত লোক এক ঘাটে স্নান করে॥
কতেক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী।
না জানি কতেক শিশু মিলে তথা আসি॥
সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে।
ক্ষণে ডুবে ক্ষণে ভাসে নানা ক্রীড়া করে॥
জলক্রীড়া করে গৌর সুন্দর-শরীর।
সবার গায়েতে লাগে চরণের নীর॥
সবে মানা করে তবু মানা নাহি মানে।
ধরিতেও কেহ নাহি পারে একস্থানে॥

লিখন-কালি—লিখিবার সময় ব্যবহৃত কালি। মজ্জিয়া—নিমগ্ন হইয়া।
সম্পত্তি—গৌরব। দান্ত—(দম্‌+ক্ত) জিতেন্দ্রিয়।

পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান।
কারে ছোঁয়, কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥
না পাইয়া প্রভুর নাগালী বিপ্রগণে।
সবে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥—
"শুন শুন, ওহে মিশ্র, পরম বান্ধব।
তোমার পুত্রের অপন্যায় কহি সব ॥
ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গাস্নান।"
কেহ বলে—"জল দিয়া ভাঙ্গে মোর ধ্যান ॥"
কেহ বলে—"পুষ্প, দূর্ব্বা, নৈবেদ্য, চন্দন।
বিষ্ণু পুজিবার সজ্জা, বিষ্ণুর আসন ॥
আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে।
সব খাই' পরি', তবে করে পলায়নে ॥"
কেহ বলে—"আমার না রহে সাজি ধুতি ॥"
কেহ বলে—"আমার চোরায় গীতা পুঁথি ॥"

কুল্লোল—কুল্‌কুচা।

নাগালী—নাগাল; সামীপ্য।

অপন্যায়—অন্যায়। খাই' পরি'—খাইয়া পরিয়া। পলায়নে—পলায়ন। চোরায়—চুরি করে। গীতা—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্‌কালে অর্জ্জুন আত্মীয়বধের আশঙ্কায় যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে মনুষ্যের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত অমূল্য উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে আছে। হিন্দুগণ এই গ্রন্থ পরমভক্তিসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন।

কেহ বলে—"পুত্র অতি বালক আমার।
কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার॥"

শচী সম্বোধিয়া বলে যতেক রমণী।—
"তনয়ের আচরণ শুন ঠাকুরাণি॥
ব্রত করিবারে যত আনি ফুল ফল।
ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল॥
স্নান করি উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে।
যতেক চপল শিশু হেরি তার সঙ্গে॥
প্রতিদিন এই মত করে ব্যবহার।
তোমার নিমাই বুঝি রাজার কুমার?
নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল।
নদীয়ায় হেন কর্ম্ম কভু নহে ভাল॥"

কান্দায়—কাঁদায়।

তোমার নিমাই...কুমার?—তোমার নিমাই কি রাজার ছেলে যে, যাহা খুসী তাহাই করিবে ও তাহার সমস্ত অত্যাচার আমাদিগকে সহ্য করিতে হইবে?

ঝাট—শীঘ্র। ছাওয়াল—ছেলে।

নিমাই পণ্ডিত

শিষ্য দেখি' পরম আনন্দে গঙ্গাদাস।
পুত্র-প্রায় করিয়া রাখিল নিজ পাশ॥
দেখিয়া অদ্ভুত বুদ্ধি গুরু হরষিত।
সর্ব্ব-গোষ্ঠী-শ্রেষ্ঠ করি করিলা পূজিত॥
ললাটে শোভয়ে ঊর্দ্ধ-তিলক সুন্দর।
শিরেতে চাঁচর কেশ সর্ব্ব-মনোহর॥
কিবা সে অদ্ভুত দুই কমল-নয়ন।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন॥
যেই দেখে, সেই একদৃষ্টে রূপ চায়।
হেন নাহি 'ধন্য ধন্য' বলি যে না যায়॥
হেন সে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সন্তোষ প্রচুর॥
গুরু বলে—"বাপ! তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবে তুমি বলিলাম দড়॥"

গোষ্ঠী—সভা, সমূহ। সর্ব্বগোষ্ঠী-শ্রেষ্ঠ করি—সমস্ত ছাত্রগণের মধ্যে নিমাইকে প্রাধান্য দিয়া।

ঊর্দ্ধতিলক—কপালের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত লম্বভাবে অঙ্কিত তিলক। চাঁচর—কোঁকড়ান। ত্রিকচ্ছ—তেকোঁচা; এখনও পূজাদি করিবার সময় তেকোঁচা করিয়া কাপড় পরিবার রীতি আছে; কচ্ছ—কাছা। দড়—ঠিক; নিশ্চয়।

প্রভু বলে—"তুমি আশীর্ব্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্ দুর্ল্লভ তাহারে?"
কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্য্যটনে
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র-বিনে॥

দিগ্বিজয়ি-জয়

হেন কালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।
আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই॥
প্রতি ঘরে ঘরে, প্রতি পণ্ডিত-সভায়।
মহাধ্বনি উপজিল সর্ব্ব-নদীয়ায়॥—
"সর্ব্ব রাজ্য দেশ জিনি' জয়পত্র লই।
নবদ্বীপে অসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী॥"
সরস্বতী-বরপুত্র শুনি সর্ব্বজনে।
পণ্ডিত সভায় বড় চিন্তা হইল মনে॥

পর্য্যটনে—ভ্রমণকালে।

দিগ্বিজয়ী—যিনি সকল দিক্ অর্থাৎ সকল দিকে অবস্থিত পণ্ডিতদিগকে বিচারে পরাজিত করিয়া জয়লাভ করিয়াছেন। পরম-অহঙ্কার-যুক্ত—অত্যন্ত-অহঙ্কার-বিশিষ্ট। হই—হইয়া। জয়পত্র—জয়সূচক পত্র, তিনি যে জয়লাভ করিয়াছেন তাহার লিখিত নিদর্শনপত্র। লই—লইয়া।

জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান।
সবে জিনি' নবদ্বীপ জগতে প্রধান॥
হেন স্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিয়া।
সংসারেতে অপ্রতিষ্ঠা ঘুষিবে শুনিয়া॥
এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে।
কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাঙ্গের স্থানে॥—
"এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি।
সর্ব্বত্র জিনিয়া বুলে জয়পত্র ধরি॥
নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায়।
নহে জয়পত্র মাগে সকল সভায়॥"

শুনি শিষ্যগণের বচন গৌরমণি।
হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী॥—
"শুন, ভাই সব, এই কহি তত্ত্বকথা।
অহঙ্কার না সহেন ঈশ্বর সর্ব্বথা॥

জম্বুদ্বীপ—ভারতবর্ষ। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল যে, জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর এই সাত মহাদ্বীপ লইয়া এই পৃথিবী গঠিত।

সবে জিনি—সকলকে জয় করিয়া। অপ্রতিষ্ঠা—অখ্যাতি। গণ—দল। বুলে—ভ্রমণ করে; আমরা এখনও বলি—"(এই খাবার) ইঁদুরে বুলে গেছে", অর্থাৎ ইহার উপর দিয়া ইঁদুর চলিয়া গিয়াছে।

তত্ত্ববাণী—সার কথা।

ফলবন্ত বৃক্ষ আর গুণবন্ত জন।
নম্রতা সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ॥
এতেক তাহার যত বিদ্যা-অহঙ্কার।
দেখিবে হেথাই সব হইবে সংহার॥"

এত বলি, হাসি প্রভু সর্ব্বশিষ্য-সঙ্গে।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে॥
ধর্ম্মকথা শাস্ত্রকথা অশেষ কৌতুকে॥
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু সুখে॥
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তথা উপনীত।
হেরি' সে অপূর্ব্ব রূপ হইল বিস্মিত॥
তাঁরে দেখি প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া।
বসিতে বলিলা অতি আদর করিয়া॥
প্রভু কহে—"তোমার কবিত্বে নাহি সীমা।
হেন নাহি, যাহা তুমি না কর বর্ণনা॥
গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন।
শুনিয়া সবার হ'ক পাপ-বিমোচন॥"

ফলবন্ত—ফল+অস্ত্যর্থে ('আছে' এই অর্থে) বৎ=ফলবৎ; ইহার পুংলিঙ্গে প্রথমার একবচনে 'ফলবান্' ও বহুবচনে 'ফলবন্তঃ'; এখানে 'ফলবান্' এই একবচনান্ত পদ হওয়াই উচিত ছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে একবচন স্থলে এইরূপ বহুবচনের প্রয়োগ অনেক দেখা যায়। যেমন—জ্বলন্ত অনল; ঘুমন্ত শিশু। অথবা বাঙ্গালায় অস্ত্যর্থে 'বন্ত' প্রত্যয়।

শুনি সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন।
সেইক্ষণে করিবারে লাগিল বর্ণন ॥
সহস্র সহস্র যত ছিল শিষ্যগণ।
অবাক্ হইলা সবে শুনিয়া বর্ণন ॥
"রাম রাম, অদ্ভুত" বলেন শিষ্যগণ।
মনুষ্যের এমত কি স্ফুরয়ে বচন ॥
পড়ি' যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।
তবে হাসি বলিলেন গৌর-সুন্দর ॥—
"তোমার যে শব্দের গ্রন্থন-অভিপ্রায়।
তুমি বিনা বুঝাইলে, বুঝা নাহি যায় ॥"
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব্বমনোহর।
ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥
ব্যাখ্যা শেষ হওয়ামাত্র, প্রভু সেইক্ষণে।
দূষিলেন আদি মধ্য অন্ত তিন স্থানে ॥
সাত পাঁচ বলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।
যা' বলেন, তাই দোষে গৌরাঙ্গ-সুন্দরে ॥

সেইক্ষণে—তৎক্ষণাৎ; নিমাই যেমন বলিলেন অমনই।
"রাম, রাম"—বিস্ময়সূচক শব্দ।
স্ফুরয়ে—বহির্গত হয়।

হৈলা অবসর—থামিলেন। গ্রন্থন-অভিপ্রায়—গাঁথিবার উদ্দেশ্য; অর্থাৎ আপনি যে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য শব্দগুলি কবিতার আকারে গাঁথিয়াছেন।

বিনা—না। দূষিলেন—দোষ ধরিলেন। প্রবোধিতে—বুঝাইতে; দোষ খণ্ডন করিতে। গৌরাঙ্গ-সুন্দরে—(সুন্দর+এ) গৌরাঙ্গসুন্দর।

সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।
আপনি না বুঝে বিপ্র কি বলে আপনে ॥
দিগ্বিজয়ী যদি পরাভবে প্রবেশিলা।
শিষ্যগণ হাসিবারে উদ্যত হইলা ॥
সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ।
বিপ্র প্রতি বলিলেন মধুর বচন ॥—
"আজি চল, মহামতি, নিজ বাসা প্রতি।
কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ॥
তুমিও হৈলে শ্রান্ত অনেক পড়িয়া।
নিশাও অনেক যায়, শুয়ে থাক গিয়া ॥"
জিনিয়াও কারো না করেন তেজ-ভঙ্গ।
সবাই পায়েন প্রীত, হেন তাঁর রঙ্গ ॥
শিষ্যগণ সহিত চলিলা প্রভু ঘর।
দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত-অন্তর ॥

প্রতিভা—কবিশক্তি। আপনে—আপনি, নিজে।
পরাভবে প্রবেশিলা—পরাজয় লাভ করিল। সংহতি—সহিত।
তেজভঙ্গ—গর্ব্বনাশ; অপমান। রঙ্গ—রীতি।
লজ্জিত-অন্তর—লজ্জিত হইয়াছে অন্তর (হৃদয়) যাহার (বহুব্রীহি)।

সিংহলে বাণিজ্যার্থ গমন করেন। সমুদ্রে চণ্ডী ছলনা করিয়া তাঁহাকে "কমলে কামিনী" রূপে দর্শন দেন। সিংহলরাজ তাহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং দর্শনার্থ আগমন করেন। ধনপতি দেখাইতে না পারায় রাজার আদেশে বন্দী হন। শ্রীমন্ত তখন বালক। বালক যখন শুনিল যে, তাহার পিতা বাণিজ্যার্থ সিংহলে গিয়াছেন আর ফিরিয়া আসেন নাই, তখন সে, কাহারও নিষেধ না শুনিয়া, পিতার অন্বেষণে বহির্গত হইল। শ্রীমন্তও সমুদ্রে "কমলে কামিনী" দর্শন করেন ও পিতার ন্যায় রাজাদেশে বন্দী হন। শ্রীমন্ত চণ্ডীর বরপুত্র ছিলেন। দেবী সিংহলরাজকে যথোচিত দণ্ড দেন। পরে সিংহলরাজ ধনপতি ও শ্রীমন্তকে মুক্তিদান করিয়া, শ্রীমন্তের সহিত নিজ দুহিতার বিবাহ দেন। ক্রমে ধনপতি চণ্ডীর ভক্ত হইলেন।

চণ্ডী ও ফুল্লরা

[চণ্ডী কালকেতুর চরিত্র পরীক্ষা করিবার জন্য, এক স্বর্ণ-গোধিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বনমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেবীর ছলনায়, সেদিন কালকেতু বনে কোন পশু শিকার করিতে পারিল না। এমন সময় সে, স্বর্ণ-গোধিকা দেখিতে পাইয়া, তাহাকে ধরিয়া ধনুর গুণে বাঁধিয়া লইয়া চলিল।

কালকেতুকে শূন্যহস্তে প্রত্যাগত দেখিয়া, তাহার স্ত্রী ফুল্লরা কাঁদিতে লাগিল। শেষে কালকেতুর উপদেশে ফুল্লরা কোন প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে চাল ধার করিতে গেল। কালকেতু হাটে চলিল। এমন সময় চণ্ডী, গোধিকা মূর্ত্তি ত্যাগ করিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দরীর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক ব্যাধের কুটীর আলো করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ফুল্লরা গৃহে ফিরিয়া আসিয়া সেই অপূর্ব্ব রমণীকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। পরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।]

ফুল্লরা। এ রূপ যৌবন, ছাড়িয়া ভবন,
কেন আইলা পরবাস ?
কহ গো সুন্দরি, কেন একেশ্বরী
ভ্রমিতেছ, নাহি ত্রাস ?

একেশ্বরী—একাকিনী। গোধিকা—গোসাপ।

চণ্ডী। কি আর জিজ্ঞাসা কর, আইলাম তব ঘর,
বীরের দেখিতে নারি দুখ।
দিয়া আপনার ধন, তুষিব বীরের মন,
আজি হৈতে সম্পদের সুখ॥
কি কব দুঃখের কথা, গঙ্গা নামে মোর সতা,
স্বামী যারে ধরেন মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায়, মোর পানে নাহি চায়,
ভবন ছাড়িনু এই দুঃখে॥
যে ঘরে সতিনী রহে, দুঃখানলে প্রাণ দহে,
গায়ে হয় গরলের জ্বালা।
বিধি মোরে হৈল বাম, না গণিনু পরিণাম,
বনবাসী হইনু একেলা॥
এবে বিধি হৈল সখা, বীর-সঙ্গে পথে দেখা,
গুণে বান্ধি আনে নিজ ঘরে।
শুন গো, ব্যাধের ঝি, তোমারে বুঝাব কি,
এবে আমি যাব কোথাকারে?

কি কব দুঃখের কথা ইত্যাদি—দ্ব্যর্থবোধক; ভারতচন্দ্রের "অন্নদা-মঙ্গলে"ও অন্নদা এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় আত্মপরিচয় দিয়াছেন। পরিণাম—শেষে কি হইবে তাহা।

সখা—অনুকূল। বীর—কালকেতু। গুণে বান্ধি আনে নিজ ঘরে—দ্ব্যর্থ-বোধক;—(১) ধনুর গুণে অর্থাৎ ছিলায় স্বর্ণগোধিকা মূর্ত্তিধারিণী আমাকে বাঁধিয়া আনিয়াছে, (২) তাহার বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া আমি আসিয়াছি।

খাও পর যত তুমি, সকল জোগাব আমি,
তুমি মোরে না ভাবিও ভিন।
সমরে কানন-ভাগে, থাকিব বীরের আগে,
আজি হৈতে সম্পদের চিন॥
ফুল্লরা। আমি তোমা বলি ভাল, স্বামীর বসতি চল,
পরিণামে পাবে বড় সুখ।
শুন গো বিমূঢ়মতি, যদি ছাড় নিজ পতি,
কেমনে দেখাবে লোকে মুখ?
স্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি,
স্বামী বনিতার যে বিধাতা।
স্বামী বনিতার ধন, স্বামী বিনা অন্য জন,
কেহ নহে সুখ-মোক্ষ-দাতা॥
সতীন কোন্দল করে, দ্বিগুণ শুনাবে তারে,
কেন ঘর ছাড় হয়ে মানী?
কোপে কৈলে বিষপান, আপনি ত্যজিবে প্রাণ,
সতীনের কিবা হবে হানি?

ভিন—ভিন্ন, অপর। কানন-ভাগে—বনের অংশে। চিন—চিহ্ন শব্দের অপভ্রংশ। মানী—অভিমানিনী; স্ত্রীলিঙ্গে মানিনী হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাঙ্গালায় অনেক সময় স্ত্রীলিঙ্গে পদের বিশেষণ পুংলিঙ্গই রাখা হয়; যথা—অতি সুন্দর বা মর্ম্মস্পর্শী ভাষা; মেয়েটি বড় অভিমানী। এখানে মিলের অনুরোধও আছে।

চণ্ডী। শুন গো আমার বাক্য ফুল্লরা সুন্দরি।
আইনু বীরের দুঃখ দেখিতে না পারি॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে।
আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে॥
হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ মহাবীরে।
যদি বীর বলে তবে যাব স্থানান্তরে॥
যে বল সে বল আমি বীরে না ছাড়িব।
দিয়া আপনার ধন দুঃখ নিবারিব॥

আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে—দ্ব্যর্থবোধক।

কালকেতুর পরীক্ষা

[ফুল্লরার অত্যন্ত দুঃখ ও স্বামীর উপর অভিমান হইল। দেবী বলিয়াছেন—'আনিল তোমার স্বামী বান্ধি নিজগুণে।' ফুল্লরা, ইহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, ভাবিল, তাহার স্বামী এই রমণীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে গৃহে আনিয়াছে। তাই সে অভিমানে স্বামীর সহিত হাটে সাক্ষাৎ করিতে চলিল। কালকেতু ফুল্লরার মুখে সেই রমণীর বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্মিত হইল। সে দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া আসিল : দেখিল—

ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরখানি করে ঝল্‌মল্।
কোটি-চন্দ্র-প্রকাশিত গগনমণ্ডল ॥

তখন সে রমণীকে প্রণাম করিয়া বলিল—]

কালকেতু। আমি ব্যাধ নীচ জাতি, তুমি রামা কুলবতী,
পরিচয় মাগে কালকেতু।
কিবা দ্বিজ-দেব-কন্যা, ত্রিভুবনে একধন্যা,
ব্যাধের মন্দিরে কিবা হেতু ?
ব্যাধ হিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়,
শ্মশান সমান এই স্থান।

একধন্যা—একমাত্র ধন্যা, অর্থাৎ বিশেষ প্রশংসনীয়া। রাঢ়—(রূঢ় শব্দ হইতে উৎপন্ন) গোঁয়ার।

কহি আমি সত্য বাণী, এই ঘরে ঠাকুরাণী,
প্রবেশে উচিত হয় স্নান ॥
ত্যজিয়া ব্যাধের বাস, চল বন্ধুজন পাশ,
থাকিতে থাকিতে দিনমণি ।
যদি হয় পাপ নিশা, লোকে কবে দুষ্ট ভাষা,
কোন্‌খানে যাপিলে রজনী ॥
কিবা পথ-পরিশ্রমে, আইলা দিকের ভ্রমে,
আয়াস ছাড়িতে এই ঘর ।
চল বন্ধুজন-পথে, ফুল্লরা চলুক সাথে,
পিছে লয়ে যাব ধনুঃশর ।

[দেবী কোন উত্তর করিলেন না । তখন কালকেতু বিরক্ত হইয়া বলিল—]

বুঝিতে না পারি গো তোমার ব্যবহার ।
যে হও সে হও তুমি, মোর নমস্কার ॥
ছাড় এই স্থান, রামা, ছাড় এই স্থান ।
আপনি রাখিলে রহে আপনার মান ॥
শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে ।
মোহিনী হইয়া ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ॥

দিকের ভ্রমে—দিক্ ভ্রম করিয়া । আয়াস ছাড়িতে—শ্রান্তি দূর করিতে । বন্ধুজন-পথে—যে পথে যাইলে আত্মীয়দিগের বাড়ী যাইতে পারিবে সেই পথে। রামা—সম্বোধনে "রামে" পদ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু শ্রুতিকটু হয় বলিয়া তাহা প্রয়োগ করা হয় নাই । বাঙ্গালায় এরূপ প্রয়োগ অনেক দেখা যায় ; যথা— "দেখ, পিতা, চেয়ে দেখ", "পিতঃ" স্থানে "পিতা" । মোহিনী—মোহকারিণী ; মন-ভুলানী ।

চোর দস্যু হৈতে তুমি নাহি কর ভয়।
চরণে ধরিয়া মাগি ছাড় গো নিলয়॥

[দেবী তখনও নিরুত্তর। তখন কালকেতু, অত্যন্ত কুপিত হইয়া, তাঁহার প্রতি শর-প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইল। তখন চণ্ডী কালকেতুর চরিত্রে প্রীত হইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন।]

চণ্ডী। আমি চণ্ডী আইলাম তোরে দিতে বর।
লহ বর, কালকেতু, ত্যজ ধনুঃশর॥
মাণিক্য অঙ্গুরী সপ্ত নৃপতির ধন।
ভাঙ্গাইয়া কাট গিয়া গুজরাট বন॥
প্রজাগণে বসাইবে দিয়া গরু ধন।
পালিবে সকল প্রজা পুত্রের মতন॥

মুরারি শীল

[কালকেতু দেবীর প্রদত্ত অঙ্গুরী বণিক্ মুরারি শীলের নিকট বিক্রয় করিতে গেল।]

বেণে বড় দুষ্টশীল, নামেতে মুরারি শীল,
লেখাজোখা করে টাকা কড়ি।
পাইয়া বীরের সাড়া, প্রবেশে ভিতর পাড়া,
মাংসের ধারয়ে দেড় বুড়ি॥
"খুড়া! খুড়া!"—ডাকে কালকেতু।
"কোথা হে বণিক্‌রাজ, বিশেষ আছয়ে কাজ,
আমি আইলাম সেই হেতু॥"
বীরের বচন শুনি, আসিয়া বলে বেণেনী,
"আজি ঘরে নাহিক পোদ্দার।
প্রভাতে তোমার খুড়া, গিয়াছে খাতকপাড়া,
কালি দিবে মাংসের উধার॥"
শুন গো, শুন গো খুড়ি, কিছু কার্য্য আছে দেড়ি,
ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।

দুষ্টশীল—দুষ্ট শীল (স্বভাব) যার। লেখাজোখা—হিসাব। ভিতর পাড়া—ভিতর বাড়ী, অন্তঃপুর। বুড়ি—পাঁচগণ্ডা কড়িতে এক বুড়ি হয়। পূর্ব্বে ক্রয়-বিক্রয়ার্থ কড়ির প্রচলন ছিল। বেণেনী—'বেণে' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ। পোদ্দার—মহাজন, যে টাকা ধার দেয়। খাতক—অধমর্ণ, যে টাকা ধার করে। উধার—ধার; বণিকের স্ত্রী ভাবিল, কালকেতু মাংসের দাম চাহিতে আসিয়াছে। দেড়ি—বিশেষ প্রয়োজনীয়।

আমার জোহার খুড়ি, বালি দেহ বাকি কড়ি,
অন্য বণিকের যাই বাড়ী ॥"

ধনের পাইয়া আশ, আসিতে বীরের পাশ,
ধায় বেণে খিড়কীর পথে।

মনে বড় কুতুহলী, কান্ধেতে কড়ির থলি,
হড়পী তরাজু করি হাতে ॥

করে বীর বেণেরে জোহার।

বেণে বলে—"ভাই-পো, এবে নাহি দেখিতো,
এ তোর কেমন ব্যবহার ॥"

"খুড়া, ভাঙ্গাইব একটি অঙ্গুরী।

হয়ে মোরে অনুকূল, উচিত করিবে মূল,
তবে সে বিপদে আমি তরি ॥"

বীর দেয় অঙ্গুরী, বেণিয়া প্রণাম করি,
জোখে রত্ন চড়ায়ে পড়্যান।

কুঁচ দিয়া করে মান, ষোল রতি দুই ধান,
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান ॥

জোহার—প্রণাম। হড়পী—পেটী। তরাজু—নিক্তি। তরি—উত্তীর্ণ হই: উদ্ধার পাই। জোখে—ওজন করে। পড়্যান—বাটখারা। কুঁচ—গুঞ্জাফল; একরতির পরিমাণ; সোনা রূপা ওজন করিতে কুঁচ ব্যবহৃত হয়। ৪ ধানে এক কুঁচ বা রতি। রস—রসপূর্ণ কবিতা। অলঙ্কারশাস্ত্রের মতে—রসাত্মক বাক্যকে কাব্য বলে। রস নয় প্রকার, যথা—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত।

অঙ্গুরী-বিনিময়

"সোনারূপা নহে, বাপা, এ বেঙ্গাপিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া, বাপু, করেছ উজ্জ্বল॥
রতিপ্রতি হৈল বীর দশগণ্ডা দর।
দু'ধানের কড়ি আর পাঁচগণ্ডা ধর॥
অষ্টপণ পাঁচগণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা বাকি ধারি দেড় বুড়ি॥
একুনে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি।
কিছু চাল ক্ষুদ লহ, কিছু লহ কড়ি॥"
বীর ভাবে—কিবা আমি দেখেছি স্বপন!
অঙ্গুরী সমান মিথ্যা সাতঘড়া ধন॥
কালকেতু বলে—"খুড়া, মূল্য নাহি পাই।
যে জন অঙ্গুরী দিল, দিব তার ঠাঁই॥"
বেণে বলে—"দরে বাড়াইলাম পঞ্চবট।
আমা সঙ্গে সওদা কর না পাবে কপট॥

বেঙ্গাপিতল—একপ্রকার পিতল। একুনে—মোট।

বীরভাবে……ধন—অঙ্গুরীর এত অল্প মূল্য শুনিয়া কালকেতু ভাবিল, দেবী যে সাতঘড়া ধন দিয়াছেন তাহাও বোধ হয় এই অঙ্গুরীর মতই মিথ্যা। বট—কড়ি। সওদা—কেনাবেচা। কপট—কপটতা, চাতুরী।

ধর্ম্মকেতু ভায়া সঙ্গে ছিল লেনা-দেনা।
তাহা হৈতে দেখি বাপা বড়ই সেয়ানা॥"
কালকেতু বলে—"খুড়া, না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাই অন্য পাড়া॥"
বেণে বলে—"দরে বাড়াইলাম আড়াই বুড়ি।
চাল ক্ষুদ না লইও, গুণে লও কড়ি॥"
হাত বদল করিতে বেণের গেল মনে।
পদ্মাবতী সহ চণ্ডী হাসেন গগনে॥
এমন সময়ে হৈল আকাশ ভারতী।—
"লইতে বীরের ধন না করহ মতি॥
সাত কোটি টাকা দেহ অঙ্গুরীর মূল।
দিয়াছেন চণ্ডী বীরে হ'য়ে অনুকূল॥"
হৃদয়ে চিন্তিয়া বেণে বলে মহাবীরে।—
"এতক্ষণ পরিহাস করিনু তোমারে॥
সাত কোটি টাকা লহ অঙ্গুরীর ধন।"
তবে অনুমতি দিলা ব্যাধের নন্দন॥

ধর্ম্মকেতু—কালকেতুর পিতা। হাতবদল—হাতের কৌশলে এক জিনিস বদলাইয়া সেইমত অন্য জিনিস দেওয়া। পদ্মাবতী—চণ্ডীর সখী। আকাশ-ভারতী—আকাশবাণী।

মগরায় ঝড়

[ধনপতি সদাগর, সিংহলে বাণিজ্যার্থ যাত্রা করিয়া, যখন মগরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন চণ্ডীর মায়ায় ঝড় উঠিল।]

ঈশানে উরিল মেঘ সঘনে চিকুর।
উত্তর পবনে মেঘ করে দুর্‌দুর্‌॥
নিমিষেকে যোড়ে মেঘ গগনমণ্ডল।
চারিমেঘে বরিষয়ে মুষলের জল॥
নদীজলে বৃষ্টিজলে উথলে মগরা।
কূল জুড়ে বহে জল একাকার ধারা॥
করিকর সমান বরিষে জলধারা।
জলে মহী একাকার নদী হৈল হারা॥
দিবানিশি সম চারি মেঘের গর্জ্জন।
কারো কথা শুনিতে না পায় কোনজন॥

ঈশানে—ঈশান কোণে; উত্তর-পূর্ব্ব কোণে। উরিল—আবির্ভূত হইল। করিকর—হাতীর শুঁড়; জলধারা হস্তিশুণ্ডের ন্যায় স্থূলাকারে পতিত হইতেছিল। নদী হৈল হারা—জলে সমস্ত একাকার হইয়া যাওয়ায় নদী চিনিতে পারা গেল না। চারি মেঘ—জ্যোতিস্তত্ত্বে চারি মেঘের উল্লেখ আছে, যথা—আবর্ত্ত—নির্জ্জল মেঘ; সংবর্ত্ত—বহুজল মেঘ; পুষ্কর—যে মেঘে কষ্টে জল হয়; দ্রোণ—যে মেঘে পৃথিবী শস্যপূর্ণ হয়।

পরিচ্ছেদ নাহি সন্ধ্যা দিবস রজনী।
স্মরয়ে সকল লোক জৈমিনি, জৈমিনি॥
ছৈঘরে পড়ে শিলা বিদারিয়া চাল।
ভাদ্রপদ মাসে যেন পড়ে পাকা তাল॥
চণ্ডীর আদেশে বীর ধায় হনূমান্।
ডিঙ্গার ছাউনি ভাঙ্গে করি খান খান॥
একে একে ছয়খান তরণি ডুবায়।
শুধু মধুকর ভাসে হংস-ডিম্ব প্রায়॥
সাধু ধনপতি বলে—শুন কর্ণধার;
বিষম সঙ্কটে পাব কিরূপে নিস্তার॥

পরিচ্ছেদ—ভাগ। পরিচ্ছেদ নাহি······রজনী—আকাশ অবিরত মেঘাচ্ছন্ন থাকায়, দিন, সন্ধ্যা বা রাত্রির কোন পার্থক্য ছিল না, সকল সময়ই অন্ধকার। জৈমিনি—জৈমিনি মুনির স্মরণে বজ্রভয় নিবারণ হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ছৈঘর—নৌকার উপর বসিবার ঘর। ভাদ্রপদ—ভাদ্রমাস। মধুকর—প্রধান নৌকার নাম।

কমলে কামিনী

ঝড় বৃষ্টি দূর হৈল চণ্ডীর কৃপায়।
ডিঙ্গা বেয়ে সদাগর দ্রুতগতি যায়॥
রাত্রিদিন বাহে সাধু তিলেক না রয়।
উপনীত সদাগর হৈল কালীদয়॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
ধনপতি ছলিবারে পাঁতিলেন মায়া॥
আপনি করিল মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈল, পদ্মা করিবর।
ভাসিতে লাগিল শতদলের উপর॥

অপরূপ হের আর, দেখ, ভাই কর্ণধার,
কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বাম করে, উগরয়ে করিবরে,
পুনরপি করয়ে সংহার॥

কালীদয়—কালীদহ ; দহ—আবর্ত্তবিশিষ্ট গভীর জল। যোগিনী—দুর্গা বা চণ্ডীর সখী, ইহাদের সংখ্যা ৬৪। অবতার—অবতীর্ণ হইয়াছে। সংহার—গ্রাস।

কমলে কনক-রুচি, স্বাহা, স্বধা, কিবা শচী,
মদনসুন্দরী, কলাবতী।
সরস্বতী, কিবা রমা, চিত্রলেখা, তিলোত্তমা,
সত্যভামা, রম্ভা, অরুন্ধতী॥
রাজহংস-রব জিনি, চরণে নূপুর-ধ্বনি,
দশ নখে দশ চন্দ্র ভাসে।
কোকনদ-দর্প হরে, যাবক-রঞ্জিত করে,
অঙ্গুলি চম্পক পরকাশে॥
অধর বিম্বক-বন্ধু, বদন শারদ ইন্দু,
কুরঙ্গ-গঞ্জন বিলোচন।

কনক-রুচি—সুবর্ণের দীপ্তি। স্বাহা, স্বধা—অগ্নিদেবের পত্নী। শচী—ইন্দ্রপত্নী। মদনসুন্দরী—মদনের স্ত্রী রতি। কলাবতী—অপ্সরা। রমা—লক্ষ্মী। চিত্রলেখা, তিলোত্তমা, রম্ভা—অপ্সরা। সত্যভামা—কৃষ্ণের এক পত্নী। অরুন্ধতী—বশিষ্ঠপত্নী। রাজহংস রব জিনি ইত্যাদি—সুন্দরীর বর্ণনায় প্রাচীন বাঙ্গালা কবিরা, সংস্কৃত কবিদিগের অনুকরণে, প্রায়ই এইরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। রাজহংস-রব জিনি—কালিদাস গৌরীর নূপুরধ্বনির সহিত রাজহংসের রবের তুলনা করিয়াছেন। দশ নখে দশ চন্দ্র ভাসে—বঙ্কিম নখাগ্রভাগের সহিত চন্দ্রকলার সাদৃশ্য আছে। কোকনদ—রক্তপদ্ম। যাবক—আলতা। কোকনদ-দর্প ইত্যাদি—রমণীর অলক্তরঞ্জিত করতল রক্তপদ্মের দর্প চূর্ণ করিয়াছে, অর্থাৎ রক্তপদ্ম অপেক্ষাও উহা অধিকতর রক্তবর্ণ। বিম্বক—তেলাকুচা ফল। বন্ধু—বাঁধুলি ফুল। শারদ—শরৎকালীন। কুরঙ্গগঞ্জন—যাহা কুরঙ্গের অর্থাৎ হরিণের চক্ষুকেও নিন্দা করে। বিলোচন—নয়ন।

প্রভাতে ভানুর ছটা, কপালে সিন্দূর-ফোঁটা,
তনুরুচি ভুবনমোহন ॥
বদন ঈষৎ মিলে, কুঞ্জর উগারে গিলে,
দেখি সাধু বিস্ময়ে মগন।
সাক্ষী করে কর্ণধারে, সে বলে দেখিলা কারে,
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

তনুরুচি—তনুর (দেহের) রুচি (শোভা)

কাশীরাম দাস

কাশীরাম দাস স্বয়ং লিখিয়াছেন—

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিঙ্গিগ্রাম।
প্রিয়ঙ্করদাস-পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠভ্রাতা॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, বর্দ্ধমান জেলায় ইন্দ্রাণী পরগণার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে কাশীরাম দাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহের নাম প্রিয়ঙ্কর, পিতামহের নাম সুধাকর ও পিতার নাম কমলাকান্ত ছিল। কমলাকান্তের তিন পুত্র—কৃষ্ণদাস, কাশীরাম, গদাধর। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কাশীরাম দাস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

কথিত আছে যে, কাশীরাম পাঠশালায় গুরু-মহাশয়গিরি করিতেন। কথক ও পুরাণ-পাঠকদিগের মুখে মহাভারতের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, তিনি বাঙ্গালা ভাষায় মহাভারত রচনা করেন। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীরাম দাসের মহাভারতও

মূল মহাভারত হইতে অনেক স্থলে ভিন্ন। পুরাণ-বর্ণিত কয়েকটি উপাখ্যান কাশীরামের মহাভারতে স্থান পাইয়াছে।

"আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা লিখি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥"

এই চলিত বাক্য হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কাশীদাস সমগ্র মহাভারত রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, কাশীদাস 'স্বর্গপুর' অর্থাৎ কাশীধামে তীর্থ করিতে গমন করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায়, কবির মূল রচনা নহে, পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক সংশোধিত সংস্করণ।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর

[ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সুশাসনে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। পাণ্ডবদিগের বলবুদ্ধিদর্শনে দুর্য্যোধনের মনে দারুণ ঈর্ষা ও ক্রোধের উদয় হইল। শেষে তিনি কৌশলে কুন্তীর সহিত পাণ্ডবদিগকে বারণাবত নগরে নির্ব্বাসিত করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। পুরোচন নামে দুর্য্যোধনের এক মন্ত্রী বারণাবত নগরে এক জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া, তন্মধ্যে পাণ্ডবদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। পাণ্ডবেরা পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, এই গৃহে তাঁহাদিগকে দগ্ধ করিয়া

হত্যা করিবার সঙ্কল্প করা হইয়াছে। একদিন রজনীযোগে তাঁহারা স্বয়ং সেই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া বারণাবত হইতে পলায়ন করিলেন। তাঁহাদিগের কষ্টের পরিসীমা রহিল না; ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা তাঁহাদিগকে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে হইত।

একদিন তাঁহারা শুনিলেন যে, পাঞ্চালদেশে পাঞ্চালরাজ যজ্ঞসেনের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর হইবে। যজ্ঞসেন এক দুরানম্য ধনু প্রস্তুত করাইয়াছেন, এবং এক কৃত্রিম আকাশ-যন্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া, তাহার সঙ্গে লক্ষ্য সংস্থাপন করিয়া, এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি সেই ধনুতে জ্যারোপণ করিয়া, শরসন্ধানপূর্ব্বক যন্ত্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে, সে-ই দ্রৌপদীকে লাভ করিবে। পাণ্ডবেরা নিতান্ত কৌতূহল-পরবশ হইয়া, জননী সমভিব্যাহারে, স্বয়ংবর দর্শন করিবার জন্য পাঞ্চালদেশে গমন করিলেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণের বেশে সভায় উপস্থিত হইলেন।

নানাদেশ হইতে রাজগণ নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদিও আসিয়াছেন। দ্রৌপদীর রূপ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন।]

রাজাদিগের লক্ষ্য বিন্ধিতে গমন

দ্রৌপদীর মুখ দেখি মোহে নৃপগণ।
শীঘ্রগতি সবাই উঠিল ততক্ষণ ॥
হুড়াহুড়ি করি সবে যায় বায়ুবেগে।
সবে বলে—"রহ, লক্ষ্য আমি বিন্ধি আগে ॥"
সুহৃদে সুহৃদে তবে উপজিল দ্বন্দ্ব।
ধনুক বেড়িয়া দাঁড়াইল নৃপবৃন্দ ॥

(জরাসন্ধ)

তবে মগধের পতি জরাসন্ধ রাজা।
রাজ-চক্রবর্ত্তী ক্ষত্রকুলে মহাতেজা ॥
ধনুক তুলিয়া সে ঝাঁকারে পুনঃপুনঃ।
নোঙাইয়া ধনুহুলে দিতে নিল গুণ ॥
অতিশয় ধনুর্দ্ধর, ধনুকের ভরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া নৃপতি পড়িল কতদূরে ॥

(দুর্য্যোধন)

তবে দুর্য্যোধন দম্ভ করিল বহুল।
ধনু ধরে জানু পাতি নোঙাইল হুল ॥
মুখে রক্ত উঠিল, কম্পিত কলেবর।
কতদূরে মূর্চ্ছা হৈয়া ধূলায় ধূসর ॥

মোহে—মোহিত হইল। ঝাঁকারে—নাড়া দিতে লাগিল। ধনুহুল—ধনুকের অগ্রভাগ বা কোণ।

(বিরাট)

তবে মৎস্য-অধিপতি বিরাট রাজন্।
ঠেলাঠেলি করি ধনু নিল প্রাণপণ ॥
তুলিতে নারিল, পুনঃ ছাড়িতে নারিল।
হাসিয়া সুশর্ম্মা রাজা ধনু কাড়ি নিল।

(শিশুপাল)

শিশুপাল মহারাজ চেদির ঈশ্বর।
বড় লজ্জা পাইল সে সভার ভিতর।
লজ্জাভয়ে প্রাণপণে নোঙাইল ধনু।
না পারিল ধৈর্য্য হতে হীনবীর্য্য তনু ॥
ধনুহুলে চিবুক লাগিয়া উলটিল।
কত দূরে রাজগণ উপরে পড়িল ॥
মুকুট ভাঙ্গিল, তনু হৈল মহাক্ষীণ।
মৃতপ্রায় হইয়া রহিল দণ্ড তিন ॥
বলবন্ত কুলবন্ত ক্ষত্রিয়প্রধান।
লক্ষলক্ষ নরপতি সবে বলবান্ ॥
একে একে সকলে বুঝিল পরাক্রম।
ধনু নোঙাইতে কেহ না হইল ক্ষম ॥
বড় বড় ভূপতির দেখি অপমান।
ভয়ে আর কেহ না হইল আগুয়ান ॥

রাজন্—রাজা ; মিলের অনুরোধে 'রাজন্' লিখিত হইয়াছে। না পারিল ধৈর্য্য হ'তে—ধীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। হীনবীর্য্য—শক্তিহীন। তনু—দেহ। চিবুক—থুতনী। বলবন্ত, কুলবন্ত—৪৭ পৃঃ পাদটীকা দেখ।

ভীষ্মাদির লক্ষ্য বিন্ধিতে চেষ্টা

হেরি রাজাদের দশা, দ্রুপদ-কুমার।
ডাকিয়া বলিল তবে মধ্যেতে সবার ॥—
"ক্ষত্রকুলে আছহ সভাতে যতজন।
যে বিন্ধিবে তারে কৃষ্ণা করিবে বরণ ॥
হউক নহুক রাজা নাহিক বিচার।
লভিবেক কৃষ্ণা লক্ষ্য বিন্ধে শক্তি যার ॥"
পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন স্বয়ংবরস্থলে।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে বলে ক্ষত্রিয় সকলে ॥

(ভীষ্ম)

তাহা শুনি উঠিলেন কুরুবংশপতি।
ধনুক নিকটে যান ভীষ্ম মহামতি ॥
তুলিয়া ধনুক ভীষ্ম দিয়া বাম জানু।
হুলে ধার নম্র করিলেন মহাধনু ॥
বল করি ধনু তুলি' গঙ্গার কুমার।
আকর্ণ পূরিয়া ধনু দিলেন টঙ্কার ॥
মহাশব্দে মোহিত হইল সর্ব্বজন।
উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন গঙ্গার নন্দন ॥—

নহুক—না হ'ক। আকর্ণ পূরিয়া—কান পর্য্যন্ত টানিয়া।

"শুনহ, পাঞ্চাল, আর যত রাজভাগ।
সবে জান আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ ॥—
কন্যায় আমার নাহি কিছু প্রয়োজন।
আমি লক্ষ্য বিন্ধিলে লইবে দুর্য্যোধন ॥"
এত বলি ভীষ্ম বাণ যুড়িল ধনুকে।
হেনকালে শিখণ্ডীকে দেখেন সম্মুখে ॥
ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা আছে খ্যাত চরাচর।
অমঙ্গল দেখিলে ছাড়েন ধনুঃশর ॥
শিখণ্ডী দ্রুপদপুত্র নপুংসকজাতি।
তার মুখ দেখি' ধনু থুইল মহামতি ॥

আমি দারা করিয়াছি ত্যাগ—রাজা শান্তনু দাসরাজের কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, দাসরাজ বলেন—আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্র যদি রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়, তবেই কন্যাদান করিতে পারি। উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত বর্ত্তমানে রাজা ইহাতে সম্মত হইতে পারিলেন না। দেবব্রত ইহা জানিতে পারিয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন—আমি সিংহাসন ত্যাগ করিলাম এবং পাছে, আমার পুত্রেরা ভবিষ্যতে রাজ্যলাভে ইচ্ছুক হয়, অতএব আরও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি চিরকুমার থাকিব। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞার জন্য দেবব্রতের নাম ভীষ্ম হইল।

শিখণ্ডী—দ্রুপদ রাজার পুত্র। ইনি কন্যারূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু রাজমহিষী স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। তদবধি শিখণ্ডী পুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন, কেহ তাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারে নাই। ক্রমে দশার্ণাধিপতির কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। দশার্ণরাজ তাঁহাকে স্ত্রী বলিয়া জানিতে পারিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শিখণ্ডী লজ্জায় বনে প্রবেশ করেন। পরে এক যক্ষের

তবে ত সভাতে ছিল যত ক্ষত্রগণ।
পুনঃ ডাক দিয়া বলে পাঞ্চাল-নন্দন ॥—
"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নানা জাতি।
যে বিন্ধিবে লবে সেই কৃষ্ণা গুণবতী ॥"

(দ্রোণ)

এত শুনি' উঠিলেন দ্রোণ মহাশয়।
শিরেতে উষ্ণীষ শোভে শুভ্র অতিশয় ॥
শুভ্র মলয়জে লিপ্ত শুভ্র সর্ব্ব অঙ্গ।
হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভে, পৃষ্ঠেতে নিষঙ্গ ॥
ধনুক লইলা দ্রোণ বলেন বচন।—
"যদি আমি এই লক্ষ্য বিন্ধি কদাচন ॥
আমাযোগ্য নহে এই দ্রুপদ-কুমারী।
সখার কুমারী হয় আপন ঝিয়ারী ॥
দুর্য্যোধনে কন্যা দিব যদি লক্ষ্য হানি।"
এত বলি ধরিয়া তুলিল বামপাণি ॥

কৃপায় পুংত্ব লাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়-লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া ইঁহাকে নপুংসক বলা হইয়াছে। নপুংসকদর্শন অমঙ্গলসূচক বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল অমঙ্গলজনক কিছু সম্মুখে দেখিলে তিনি অস্ত্রত্যাগ করিবেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া, অর্জ্জুন ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিতে যান ও ভীষ্ম অস্ত্র ত্যাগ করিলে তাঁহাকে নিহত করেন।

মলয়জ—মলয়পর্ব্বতজাত, চন্দন। নিষঙ্গ—তূণীর। সখার কুমারী—দ্রুপদ ও দ্রোণ এক গুরুর নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন বলিয়া উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব ছিল।

তবে দ্রোণ লক্ষ্য দেখে জলের ছায়াতে।
অপূর্ব্ব রচিল লক্ষ্য দ্রুপদ নৃপেতে॥
পঞ্চ ক্রোশ উর্দ্ধেতে সুবর্ণ মৎস্য আছে।
তার অর্দ্ধপথে রাধাচক্র ফিরিতেছে॥
নিরবধি ফিরে চক্র অদ্ভুত-নির্ম্মাণ।
মধ্যে রন্ধ্র আছে, মাত্র যায় এক বাণ॥
উর্দ্ধ দৃষ্টি কৈলে মৎস্য না পাই দেখিতে।
জলেতে দেখিতে পাই চক্রছিদ্র-পথে॥
অধোমুখ চাহিয়া থাকিবে মৎস্য লক্ষ্য।
উর্দ্ধবাহু বিন্ধিবেক শুনিতে অশক্য॥
তবে দ্রোণাচার্য্য বাণ আকর্ণ পূরিয়া।
চক্র-ছিদ্রপথে বিন্ধে জলেতে চাহিয়া॥
মহাশব্দে উঠে বাণ গগনমণ্ডলে।
সুদর্শনে ঠেকিয়া পড়িল ভূমিতলে॥
লজ্জিত হইয়া দ্রোণ ছাড়িল ধনুক।
সভাতে বসিল গিয়া হৈয়া অধোমুখ॥

(কর্ণ)

তবে কর্ণ মহাবীর সূর্য্যের নন্দন।
ধনুর নিকটে শীঘ্র করিল গমন॥

নৃপেতে—নৃপ, ৩৮ পৃঃ টীকা। সুদর্শন বিষ্ণুর চক্র, রাধাচক্র।

কর্ণের সম্বন্ধে মূল মহাভারতে আছে যে, দ্রৌপদী "আমি সূতপুত্রকে বিবাহ করিব না" এই কথা বলায় কর্ণ ধনু ত্যাগ করিয়াছিলেন। কর্ণ সূর্য্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে জন্মলাভ করিলেও, জন্মাবধি এক সূত বা সারথিজাতীয় ব্যক্তির গৃহে লালিতপালিত হইয়াছিলেন; এইজন্য লোকে তাঁহাকে সূতপুত্র বলিয়াই জানিত।

বাম হস্তে ধরে ধনু দিয়া পদভর।
খসাইয়া গুণ পুনঃ যুড়ে বীরবর॥
টঙ্কারিয়া গুণ পুনঃ যুড়ি বীর বাণ।
ঊর্দ্ধকরে অধোমুখে পূরিল সন্ধান॥
ছাড়িলেক বাণ বায়ুভরে বেগে ছুটে।
জ্বলন্ত অনল যেন অন্তরীক্ষে উঠে॥
সুদর্শন চক্রে ঠেকি চূর্ণ হৈয়া গেল।
তিলবৎ হৈয়া বাণ ভূতলে পড়িল॥
লজ্জা পেয়ে কর্ণ, ধনু ভূতলে ফেলিয়া
অধোমুখ হৈয়া সভামধ্যে বৈসে গিয়া।

অর্জ্জুনের লক্ষ্য বিন্ধিতে গমন

দ্বিজ-সভা-মধ্যেতে বসিয়া যুধিষ্ঠির।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টি' বসিয়াছে চারি বীর॥
আর যত বসিয়াছে ব্রাহ্মণমণ্ডল।
দেবগণ-মধ্যে যেন শোভে আখণ্ডল॥

আখণ্ডল—ইন্দ্র।

নিকটেতে ধৃষ্টদ্যুম্ন পুনঃ পুনঃ ডাকে।—
"লক্ষ্য বিন্ধ আসিয়া যাহার শক্তি থাকে॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিবে কন্যা লবে সেই বীর।"
শুনি' ধনঞ্জয় চিত্তে হইল অস্থির॥
বিন্ধিব বলিয়া লক্ষ্য করি হেন মনে।
যুধিষ্ঠির পানেতে চাহেন অনুক্ষণে॥
অর্জ্জুনের চিত্ত বুঝি কহেন ইঙ্গিতে।
আজ্ঞা পাইয়া ধনঞ্জয় উঠেন ত্বরিতে॥
অর্জ্জুন চলিয়া যান ধনুকের ভিতে।
দেখিয়াত দ্বিজগণ লাগে জিজ্ঞাসিতে॥—
"কোথাকারে যাহ, দ্বিজ, কিসের কারণ?
সভা হৈতে উঠে যাহ কোন্ প্রয়োজন?"
অর্জ্জুন বলেন—"যাই লক্ষ্য বিন্ধিবারে।
প্রসন্ন হৈয়া সবে আজ্ঞা দেহ মোরে॥"
শুনিয়া হাসিল যত ব্রাহ্মণমণ্ডল।—
"কন্যারে দেখিয়া দ্বিজ হইল পাগল॥
যে ধনুতে পরাজয় পায় রাজগণ।
জরাসন্ধ, শাল্ব, দ্রোণ, কর্ণ, দুর্য্যোধন॥
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে, দ্বিজ, যাহ কোন্ লাজে?
ব্রাহ্মণেতে হাসাইল ক্ষত্রিয়-সমাজে॥

ভিতে—দিকে। ব্রাহ্মণেতে— ৩৮ পৃঃ টীকা।

বলিবেক ক্ষত্র যত—লোভী দ্বিজগণ।
হেন বিপরীত আশা করে সে কারণ॥
বহুদূর হৈতে আসিয়াছে দ্বিজগণ।
বহু আশা করিয়াছে পাবে বহু ধন॥
সে সব হইবে নষ্ট তোমার কর্ম্মেতে।
অসম্ভব আশা কেন কর, দ্বিজ, ইথে?”
এত বলি ধরাধরি করি’ বসাইল।
দেখি ধর্ম্মপুত্র দ্বিজগণেরে কহিল॥—
“কি কারণে, দ্বিজগণ, কর নিবারণ?
যার যত পরাক্রম সে জানে আপন॥
যে লক্ষ্য বিন্ধিতে ভঙ্গ দিল রাজগণ।
শক্তি না থাকিলে তথা যাবে কোন্ জন?
বিন্ধিতে না পারিলে আপনি পাবে লাজ।
তবে নিবারণে আমা-সবার কি কাজ?”
যুধিষ্ঠির-বাক্য শুনি ছাড়ি দিল সবে।
ধনুর নিকটে ধনঞ্জয় যান তবে॥

হাসিয়া ক্ষত্রিয় যত করে উপহাস।—
“অসম্ভব কর্ম্মে দেখি দ্বিজের প্রয়াস॥
সভামধ্যে ব্রাহ্মণের মুখে নাহি লাজ।
যাহে পরাভব হৈল রাজার সমাজ॥

ইথে—এ বিষয়ে।

সুরাসুর-জয়ী যেই বিপুল ধনুক।
তাহে লক্ষ্য বিন্ধিবারে চলিল ভিক্ষুক॥
লজ্জাহীন ব্রাহ্মণেরে অল্পে না ছাড়িব।
উচিত যে শাস্তি হয় অবশ্য তা দিব॥"

কেহ বলে—"ব্রাহ্মণেরে না কহ এমন।
সামান্য মনুষ্য বুঝি না হবে এজন॥
দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল-আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখি চারু যুগ্মভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥

মনসিজ—মনসি অর্থাৎ মনে জাত, মদন। যুগ্মনেত্র—নয়নদ্বয়। শ্রুতি—কর্ণ। অনুপম—যাহার উপমা অর্থাৎ তুলনা নাই। নীলোৎপল-আভা—নীলপদ্মের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। মুখরুচি—মুখশোভা। শুচি—নির্ম্মল। সিংহগ্রীব—সিংহের ন্যায় গ্রীবা অর্থাৎ গলদেশ যার। বন্ধুজীব—বাঁধুলি ফুল। তুল—তুলনা। খগরাজ—খগ অর্থাৎ পক্ষীদিগের রাজা, গরুড়। প্রসর—বিস্তৃত, বিশাল। কি সানন্দ...করিবর—বৃহদাকার মদমত্ত হস্তীর ন্যায় আনন্দভরে ধীরে ধীরে কি সুন্দর গমন করিতেছে।

ভুজযুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর যুগবর জানু সুললিত॥
মহাবীর্য্য, যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশু-জালে আচ্ছাদিত॥
এইক্ষণে লয় মনে বিন্ধিবেক লক্ষ্য।"
কাশী বলে—কৃষ্ণজনে কি কর্ম্ম অশক্য॥

অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ

ধনু লইয়া পাঞ্চালে বলেন ধনঞ্জয়।—
"কি বিন্ধিব, কোথা লক্ষ্য বলহ নিশ্চয়॥"
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে—"এই দেখহ জলেতে।
চক্র-ছিদ্রপথে মৎস্য পাইবে দেখিতে॥
কনকের মৎস্য, তার মাণিক নয়ন।
সেই মৎস্য-চক্ষু বিন্ধিবেক যেই জন।

ভুজযুগে নিন্দে নাগে—সর্প জিনিয়া ভুজদ্বয় বিলম্বিত। আজানুলম্বিত—জানু পর্য্যন্ত লম্বিত; এরূপ হস্ত বীরত্বসূচক। করি-কর—হস্তীর শুঁড়; জানুদেশ হইতে পা দুইটি ক্রমশঃ সরু হইয়া যেন হাতীর শুঁড়ের মত শোভা পাইতেছে। অগ্নি-অংশু ইত্যাদি—অগ্নি-কিরণ যেন ধুলায় আবৃত হইয়াছে; ছদ্মবেশের সহিত ধুলার তুলনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণজনে—কৃষ্ণের প্রিয়পাত্রের পক্ষে। অশক্য—দুষ্কর।

সে হইবে বল্লভ আমার ভগিনীর।"
এত শুনি জলে দেখে পার্থ মহাবীর॥
উর্দ্ধবাহু করিয়া আকর্ণ টানে গুণ।
অধোমুখ করি বাণ ছাড়েন অর্জ্জুন॥
সুদর্শন জগন্নাথ করেন অন্তর।
মৎস্যচক্ষু বিন্ধিলেক অর্জ্জুনের শর॥
মহাশব্দে মৎস্য যদি হইলেক পার।
অর্জ্জুনের সম্মুখে আইল পুনর্ব্বার॥
আকাশে অমরগণ পুষ্পবৃষ্টি কৈল।
জয় জয় শব্দ দ্বিজ-সভামধ্যে হৈল॥
বিন্ধিল বিন্ধিল বলি হৈল মহাধ্বনি।
শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন যত নৃপমণি॥
হাতেতে দধির পাত্র লৈয়া পুষ্পমালা।
দ্বিজেরে বরিতে যায় দ্রুপদের বালা॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সব নৃপমণি।
ডাকিয়া বলিল—"রহ রহ, যাজ্ঞসেনি॥
ভিক্ষুক দরিদ্র এ সহজে হীন-জাতি।
লক্ষ্য বিন্ধিবারে কোথা ইহার শকতি?
মিথ্যা গোল কি কারণে কর দ্বিজগণ?
গোল করি কন্যা কোথা পাইবে ব্রাহ্মণ?

বল্লভ—প্রিয় অর্থাৎ স্বামী। জগন্নাথ—জগতের প্রভু অর্থাৎ কৃষ্ণ। করেন অন্তর—সরাইয়া লইলেন। যাজ্ঞসেনি—হে যজ্ঞসেন-নন্দিনি দ্রৌপদি।

পঞ্চ ক্রোশ ঊর্দ্ধে লক্ষ্য শূন্যেতে আছয়।
বিন্ধিছে কি না বিন্ধিছে কে জানে নির্ণয় ?”
তবে ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ বহু দ্বিজগণ।
নির্ণয় করিতে জল করে নিরীক্ষণ॥
শিষ্টে বলে—“বিন্ধিয়াছে”, দুষ্টে বলে—“নয়।
ছায়া দেখি কি প্রকারে হইবে প্রত্যয় ?
শূন্য হ’তে মৎস্য যদি কাটিয়া পাড়িবে।
সাক্ষাতে দেখিলে তবে প্রত্যয় জন্মিবে॥
কাটি পাড় মৎস্য, যদি আছয়ে শকতি।”
এইরূপে কহিল যতেক দুষ্টমতি॥
শুনিয়া বিস্মিত হৈল পাঞ্চালনন্দন।
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর বলেন বচন॥—
“অকারণে মিথ্যা কথা কহ কেন সবে ?
মিথ্যা কথা কহে যে সে কার্য্য নাহি লভে॥
কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে ?
কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে ?
সর্ব্বকালে রজনী দিবস নাহি হয়।
মিথ্যা—মিথ্যা, সত্য—সত্য, লোকে খ্যাত হয়॥
একবার নাহি বলি সম্মুখে সবার।
যতবার কহিবে বিন্ধিব ততবার॥”

তিলক—ফোঁটা। ভালে—কপালে।

এত বলি অর্জ্জুন নিলেন ধনুঃশর।
আকর্ণ পূরিয়া বিন্ধিলেন দৃঢ়তর॥
সুরাসুর নাগ নর দেখয়ে কৌতুক
কাটিয়া পড়িল লক্ষ্য সবার সম্মুখ॥
দেখিয়া বিস্ময় ভাবে সব রাজগণ।
জয় জয় শব্দ করে সকল ব্রাহ্মণ॥

রামেশ্বর

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বরদা পরগণার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে তাঁহার পূর্ব্বনিবাস ছিল। পরে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের সভাসদ্ হন। যশোবন্ত সিংহের আদেশে কবি "শিবসঙ্কীর্ত্তন" বা "শিবায়ন" নামক কাব্য রচনা করেন।

"শিবায়ন" ভিন্ন কবির রচিত আঁর একখানি সুপ্রসিদ্ধ কাব্য-গ্রন্থ আছে; উহার নাম "সত্যনারায়ণের কথা।" এই কাব্য পূর্ণিমাদি তিথিতে পরম-ভক্তি-সহকারে হিন্দুর গৃহে পঠিত হইয়া থাকে। লোকে তন্ময় হইয়া ইহা শ্রবণ করে। ভগবান্ এক; রাম ও রহিমে কোন ভেদ নাই;—এই অতি সত্য ও উদার কথা "সত্যনারায়ণের কথায়" বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান যে দেশের দুই বাহুস্বরূপ, সে দেশে এই উদার মতের উপর এই উভয় সম্প্রদায়ের মিলন-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণ তাঁহাদিগের কাব্যবর্ণিত দেবদেবী-চরিত্রগুলি তত্তৎকালের বাঙ্গালী-সমাজের ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের কাব্যে দেখা যায় যে—"দেবতাদিগের মধ্যেও দম্পতি-কলহ আছে, ঘর-জামাইয়ের লাঞ্ছনা আছে।

অমর-রমণীরা দরিদ্র, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, বধির, দুর্ম্মুখ পতিগণের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, স্বস্ব ভাগ্যের নিন্দা করেন। দেবগণেরও কেহ কেহ, অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হওয়ায়, স্ত্রীর গঞ্জনায়, জমিদারের নিকট হইতে মৌরসী স্বত্বে জমি লইয়া চাষ-বাসের চেষ্টা করেন, তৈজসপত্র বাঁধা দিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করেন; কেহ এমন দরিদ্র যে, স্ত্রীকে একজোড়া শাঁখা কিনিয়া দিতে পারেন না; স্ত্রী সেই খেদে রাগ করিয়া ছেলে দুইটিকে সঙ্গে লইয়া বাপের বাড়ী চলিয়া যান। দেবতাদিগেরও ধোপা-নাপিত আছে। তাঁহারাও নিমঝোল, শুক্তা, পল্‌তা ও ফুলবড়ি ভাজা, কুল ও কাসন্দির অম্বল খাইতে ভালবাসিতেন; ক্রমে অধিকতর সভ্য হইয়া 'সঘৃত পলান্ন' পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া রসনার তৃপ্তি সাধন করিতেন।" *

বোধ হয়, রামেশ্বরের 'শিবায়নে' এই ভাব চরমসীমায় উঠিয়াছিল। তিনি শিবকে বাগ্দী ও গৌরীকে বাগ্দিনী পর্য্যন্ত সাজাইয়াছিলেন।

রামেশ্বর বড় অনুপ্রাসপ্রিয় ছিলেন। অনেকস্থলে এই অনুপ্রাসের বাহুল্যে রচনার প্রাঞ্জলতা নষ্ট হইয়াছে।

* লেখক-প্রণীত "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" হইতে উদ্ধৃত

হিমালয়-বর্ণন

[মহাকবি কালিদাসের "কুমার-সম্ভব" নামক মহাকাব্যের প্রারম্ভে হিমালয়ের যে সুন্দর বর্ণনা আছে, নিম্নলিখিত বর্ণনাটি তাহারই অনুবাদ। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণ, তাঁহাদিগের কাব্যের জন্য, সংস্কৃত সাহিত্যের অনন্ত রত্ন-ভাণ্ডার হইতে বিবিধ উপাদান সংগ্রহ করিতেন।]

উত্তরে করিয়া স্থিতি, আছেন নগাধিপতি,
হিমালয় দেবাত্মা প্রচণ্ড ;
পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে, বিভাগ করিল তারে,
যেন পৃথিবীর মানদণ্ড ॥

নগাধিপতি—নগ অর্থাৎ পর্ব্বতদিগের রাজা ; গিরিরাজ। দেবাত্মা—দেব হইয়াছেন আত্মা অধিষ্ঠাতা যার ; বাহ্যদৃষ্টিতে হিমালয় পাষাণস্তূপ মাত্র ; কিন্তু তন্মধ্যে যে দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, তিনিই প্রকৃত হিমালয় ; তাঁহারই পত্নী—মেনকা ও কন্যা—গৌরী। প্রচণ্ড—প্রভূত বীর্য্যশালী। পয়োনিধি পূর্ব্বাপরে ইত্যাদি—কালিদাস "কুমারসম্ভব" নামক কাব্যে লিখিয়াছেন—হিমালয় পূর্ব্ব ও অপর অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহন করিয়া পৃথিবীর দৈর্ঘ্যজ্ঞাপক দণ্ডস্বরূপ অবস্থান করিতেছেন। প্রাচীন সংস্কৃত কবিগণ পৃথিবী বলিতে প্রধানতঃ ভারতবর্ষকেই বুঝিতেন ; ভারতবর্ষের পূর্ব্বে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র ; হিমালয় ভারতবর্ষের একপ্রান্ত অর্থাৎ পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে অপর প্রান্ত অর্থাৎ পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

সুমেরু থাকিতে উচ্চ, যাহারে করিয়া বৎস,
পৃথু করে পৃথিবী দোহন।
সর্ব্বশৈল হ'য়ে জড়, ব্যাপার করিল বড়,
হৈল রত্ন মহৌষধিগণ॥
অনন্ত রত্নের প্রভু, কোন দোষ নাই কভু,
সবেমাত্র হিমের আলয়।

সুমেরু থাকিতে...দোহন—সুমেরু পর্ব্বত উচ্চ অর্থাৎ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হইলেও, যে হিমালয়কে বৎস করিয়া পৃথু রাজা পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন; ইহাতে হিমালয় যে সুমেরু হইতেও শ্রেষ্ঠ, এই কথাই বলা হইতেছে। কিন্তু ইহা প্রকৃত ঘটনা নহে; পৃথু রাজা স্বয়ং পৃথিবী দোহন করেন নাই, সুমেরুই পৃথুর উপদেশানুসারে দোহন করিয়াছিলেন। তাহার ইতিবৃত্ত এই—বেণ নৃপতি অত্যন্ত প্রজাপীড়ক ছিলেন; এইজন্য ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রপ্রভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়া, তাঁহার পুত্র পৃথুকে নৃপতি করেন। অরাজকের সময় পৃথিবী সমস্ত শস্যাদি গ্রাস করেন। প্রজারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পৃথুকে এ কথা জানাইল। তখন প্রজাবৎসল পৃথু ধনু লইয়া পৃথিবীর প্রতি ধাবমান হইলেন। পৃথিবী গোরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে পলায়নে অসমর্থ হইয়া পৃথুকে বলিলেন—"সমস্ত শস্যাদি দুগ্ধে পরিণত হইয়া আমার দেহে রহিয়াছে; আপনি আমার দোহনের ব্যবস্থা করুন; তাহা হইলে তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবেন।" তখন পৃথুর আদেশে সমস্ত শৈল মিলিয়া হিমালয়কে বৎস ও মহাবল মেরু পর্ব্বতকে দোগ্ধা করিয়া পৃথিবীকে দোহন করিতে লাগিল। তাহাতে যাবতীয় রত্নাদি উৎকৃষ্ট বস্তুর উদ্ভব হইল। পৃথু অতি প্রজারঞ্জক ছিলেন; এই জন্য তিনিই প্রথম 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। পৃথু হইতে পৃথিবী নাম হইয়াছে। বৎসের প্রতিই গাভীর স্নেহ সমধিক। অতএব পৃথিবী হিমালয়কেই সার পদার্থগুলি দিয়াছিলেন, ইহাই ধ্বনিত হইতেছে।

হিমের আলয়—তুষারের আশ্রয়স্থান।

এক দোষ গুণরাশি নাশে নাহি, যেন শশী
শশে ভাসে শোভা-সমুচ্চয় ॥
দক্ষে বাম হৈতে ধাতা, যার ঘরে জগন্মাতা,
সবে দেখে জন্মিলেন শিবা।
তার ভাগ্য ত্রিভুবনে, তুলনা কাহার সনে,
কহিব তাহার যশ কিবা ॥

এক দোষ……সমুচ্চয়—এক দোষ গুণরাশিকে নাশ করিতে পারে না; যেমন চন্দ্র শশে অর্থাৎ কলঙ্ক থাকিলেও শোভারাশিরূপে ভাসে অর্থাৎ দীপ্তি পায়। যেমন চন্দ্রের একমাত্র কলঙ্কে তাহার শোভার হানি না হইয়া বরং বৃদ্ধিই হয়, সেইরূপ হিমালয় সর্ব্বদা তুষারে আচ্ছন্ন এই এক দোষে তাহার গুণরাশির কোন হানি হয় নাই। শশ—শশক, খরগোষ; চন্দ্রের কলঙ্ক সম্বন্ধে কথিত হয় যে, চন্দ্র যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হওয়ায়, তৎপ্রতীকারার্থ সর্ব্বদা ক্রোড়ে একটি শশক ধারণ করিয়া থাকেন; ঐ শশকের চিহ্নই উঁহার দেহে কলঙ্করূপে দৃষ্ট হয়।

দক্ষে বাম হৈতে ধাতা—দক্ষরাজ তাঁহার কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ দেন। কিন্তু দক্ষ জামাতার প্রতি আদৌ প্রসন্ন ছিলেন না। একবার যজ্ঞ করিয়া সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন, কিন্তু শিবকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী শিবের নিষেধ সত্ত্বেও, যজ্ঞ দেখিতে আসেন এবং যজ্ঞস্থলে শিবের নিন্দা শুনিয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাহাতে শিব কুপিত হইয়া যজ্ঞ পণ্ড করেন ও দক্ষকে নিহত করেন। পরে দক্ষ ছাগমুণ্ডযুক্ত হইয়া পুনর্জ্জীবিত হন। দক্ষযজ্ঞে প্রাণত্যাগ করিয়া সতী হিমালয়-কন্যা গৌরীরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিবা—শুভদায়িনী, অথবা শিবের পত্নী।

শিবের প্রতি চাষের উপদেশ

[শিব দরিদ্র, ভিখারী ; সংসারে বড় অভাব। সুগৃহিণী গৌরী অনেক কষ্টে কোনরূপে সংসার চালাইতেছেন, আর পারেন না। এইজন্য শিবকে চাষবাস করিবার উপদেশ দিতেছেন। চির-অভাবগ্রস্ত বাঙ্গালীর সংসারের ইহা একটি সুন্দর বর্ণনা। আমাদের কুললক্ষ্মীগণ কিরূপ কায়ক্লেশে সংসার চালাইয়া থাকেন, তাহা এই কবিতায় উজ্জ্বলরূপে চিত্রিত হইয়াছে।]

শিবা বলে—সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে।
মনে কর, মহাপ্রভু, কতকাল খেলে ॥
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেলে দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে ॥
পুণ্যবান্ লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ করি উথলায় গারি ॥

শিবা—শিবপত্নী গৌরী। ফেলে দিয়া পুরুষ ইত্যাদি—পুরুষ উপার্জ্জন করিয়া উপার্জ্জিত ধন গৃহিণীর নিকট ফেলিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়। পাসরে—ভুলিয়া যায়, অর্থাৎ নিশ্চিন্ত হয়। উত্তম উদ্‌যোগ—যথেষ্ট চেষ্টা। গারী—ঘর ; সংসার। উথলায় গারী—সংসারে উপচয় করে, অর্থাৎ সমস্ত অভাব পূর্ণ হইয়াও দ্রব্যাদি উদ্‌বৃত্ত হয়।

লঙ্কার বাণিজ্য যদি এনে দেয় ঘরে।
মেয়ে হ'লে উলুই, উড়ায় আঁখি-ঠারে॥
আমি আত্ম-বড়াই বাড়ায়ে ক'ব কত।
গঙ্গাধরে গোচর গৌরীর গুণ যত॥
শোধন করিয়া সর্ব্ব সাধবের ঋণ।
কায়ক্লেশ করিয়া কুলানু কতদিন॥
ছ'মাসের সম্বল এখন ঘরে আছে।
ফুরাইলে ফের, কান্ত, কষ্ট পাও পাছে॥
সঞ্চ করি' বঞ্চিবার বাঞ্ছা কর শূলি।
বসে খেতে বাঁচে নাই-বারিধির বালি॥
পূর্ব্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে।
আর নাকি ভিখ মাগা শোভা করে শিবে॥
পুরুষে উপায় নাই, খেতে হৈল ঢের।
দিন দু'টি ছেলেতে ছড়ায় পাঁচ সের॥
বিনা অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন।
ভেবে ভেবে ভবানীর তনু হৈল ক্ষীণ॥

উলুই—অলক্ষ্মী শব্দ হইতে, অপচয়কারিণী। আঁখি-ঠারে—চক্ষের পলকে। গঙ্গাধরে গোচর—গঙ্গাধর অর্থাৎ শিবের বিদিত। আত্মবড়াই—নিজের প্রশংসা। সাধবের—সাধু (বণিক্) শব্দ হইতে; মহাজনের। সঞ্চ—সঞ্চয়। বঞ্চিবার—জীবনযাপন করিবার। শূলি—হে মহাদেব (সংস্কৃত শূলিন্ পদ হইতে); বাঙ্গালায় ইন্‌ভাগান্ত সংস্কৃত শব্দগুলির সম্বোধনে পদান্ত্য 'ন' কোথাও থাকে, কোথাও লোপ করা হয়। বারিধি—সমুদ্র। পুরুষে উপায় নাই—পুরুষ অর্থাৎ গৃহস্বামী উপার্জ্জনে অক্ষম। অবলম্বন—উপায়।

চিন্তিলাম, চন্দ্রচূড়, চাষ বড় ধন।
চাষ চষ বারেক, বর্ত্তুক পরিজন॥
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে।
লঙ্কার বাণিজ্য বসে বাকুড়ির কোণে॥
পরিজন পোষে চাষী, সুধে সাধু রাজা।
লক্ষপোষা চাষী করে সবাকারে তাজা॥
জীবের নিমিত্ত শিবে করিবেন চাষা।
এইরূপে ঈশ্বরকে ইত্যাদির ভাষা॥
চণ্ডীর চরিত্র শুনে চাঁদে দিয়া হাত।
চেয়ে রয় চন্দ্রচূড়, চিন্তে জগন্নাথ॥

চন্দ্রচূড়—চন্দ্র হইয়াছে চূড়ায় অর্থাৎ মস্তকে যাঁর। বর্ত্তুক—বাঁচুক। লঙ্কার বাণিজ্য—লঙ্কার সমৃদ্ধির কথা প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যে খুব প্রচলিত; এখনও আমরা বলি লঙ্কায় সোনা শস্তা। বাকুড়ি—(বাটী বা বাটিকা হইতে ?) বাড়ী। চাষীর গৃহে লঙ্কার বাণিজ্যের দ্রব্য থাকে, অর্থাৎ তাহার কোন দ্রব্যেরই অভাব হয় না।

সুধে—জিজ্ঞাসা করে; ডাকিয়া কথা কয়। সুধে ইত্যাদি—রাজা ও বণিক্ চাষীর সহিত আদর করিয়া কথা কহেন। লক্ষপোষী—লক্ষ লোককে যে প্রতিপালন করে। তাজা—সতেজ। ইত্যাদি—ইতর ব্যক্তি; এখনও আমরা চলিত কথায় নিকৃষ্ট শ্রেণীর লোকদিগকে 'ইত্যাদি লোক' বলিয়া থাকি। জীবের নিমিত্ত ইত্যাদি—পরিশ্রমবিমুখ বাঙ্গালী যুবকগণের মনে রাখা উচিত যে, স্বয়ং শিব চাষ করিয়াছেন; চাষবাস হীনবৃত্তি নহে, এবং 'চাষা'ও ঘৃণার্হ নহে।

সত্যপীরের প্রকাশ

দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর।
তাহে এক বিপ্র ছিলা বড়ই বিহুর ॥
খেতে তাঁর চা'ল নাই, চালে নাই খড়।
তিনি প্রভু পীর-পুত্র, তাঁর পায়ে গড় ॥
আপনি অত্যন্ত যতি, সতী সীমন্তিনী।
দামোদরে দৃঢ়ভক্তি দিবসরজনী ॥
আপনি অতিথিপ্রিয়, ততোধিক প্রিয়া।
আত্ম-উপবাস, অন্ন অন্যজনে দিয়া ॥
জঠরের জ্বালায় যখন জীউ যায়।
তখন মগন-মন গোবিন্দের পায় ॥
কতকালে কৃষ্ণ পাব, ভেবে দিবারাতি।
বান্ধিলা প্রেমের পাশে অখিলের পতি ॥
নানারূপে বিড়ম্বিয়া হারিলেন হরি।
ভক্ত বটে, কলিতে কিরূপে কৃপা করি ॥

বিহুর—কুরুবংশীয় বিহুরের ন্যায় দরিদ্র অথচ পরম ধার্মিক। যতি—ঈশ্বর-চিন্তায় যত্নবান্। সীমন্তিনী—পত্নী। জীউ—জীব শব্দের অপভ্রংশ, জীবন। মগন-মন—মগ্ন হইয়াছে মন যাহাদের। প্রেমের পাশে—ভক্তিবন্ধনে। অখিলের পতি—জগতের পতি। বিড়ম্বিয়া—ছলনা করিয়া।

ভিক্ষা ভাঙ্গি, ভক্তি বুঝি, ভ্রমি সাথে সাথে।
পীর হ'য়ে পশ্চাৎ প্রত্যক্ষ হব পথে॥
ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় যেতে, তাতে কৈলা মায়া।
যত দাতা জীবে হরি হরিলেন দয়া॥
ঘরে ঘরে ফিরে দ্বিজ, ডাকে কলস্বনে।
কেহ ঘরে নাই, কেহ থাকিয়া না শোনে॥
কেহ বলে—ফিরে মাগ, প্রসবেছে নারী।
কেহ বলে—নিত্য কি তোমায় ধার ধারি?
কেহ গালি দেয়, কেহ করে দূর দূর।
মারিতে চলিল কেহ হইয়া নিষ্ঠুর॥
প্রতি ঘরে ভ্রমি, ভিক্ষা না পেয়ে নগরে।
দাতা-কৃষ্ণ কোথা?—বলি কান্দে উচ্চস্বরে॥
বাটী-বাটে গিয়া মাঠে অপরাহ্ণ-কালে।
বিষাদে বসিলা বিপ্র বটবৃক্ষ-তলে॥

ভিক্ষা ভাঙ্গি—ভিক্ষা ভঙ্গ করিয়া, অর্থাৎ যাহাতে কোথাও ভিক্ষা না পায় তাহা করিয়া। যত দাতা জীবে ইত্যাদি—সমস্ত দাতার মন হইতে দয়া হরণ করিলেন।

কলস্বনে—মিষ্টস্বরে, বিনয়পূর্ণ বাক্যে। ফিরে মাগ—অন্য বাড়ীতে গিয়া ভিক্ষা কর। প্রসবেছে নারী—গৃহে নারী প্রসব করিলে অশৌচ থাকা পর্য্যন্ত ভিক্ষা না দিবার রীতি আছে; এরূপ গৃহ হইতে যে তণ্ডুলাদি পাওয়া যায়, তাহা দেবতাকে নিবেদন করা যায় না। বাটী-বাটে—বাটী যাইবার পথে; যেমন—বন্ধু-জন-পথে (৫৮ পৃঃ টীকা)।

কে করিবে আশ্বাস, নিশ্বাস ঘন ছাড়ে।
ছল্‌ছল্‌ চক্ষে জল টস্‌টস্‌ পড়ে ॥
ধৈরজ না ধরে দ্বিজ, ধৈরজ না ধরে।
বাড়িল বিবেগ বড় ব্রাহ্মণীর তরে ॥
বুভুক্ষিতা বনিতা বাটীতে বাট চেয়ে।
কেন, প্রভু, হেন কৈলে দীনবন্ধু হয়ে ॥
মাগিলে না মিলে মুষ্টি, রিক্ত হস্তে যাই।
পূর্ব্বকৃত পাপে এত পরিতাপ পাই ॥
এ পাপ শরীর আর না রাখিব আমি।
পরলোকে, প্রভু, পরিত্রাণ ক'রো তুমি ॥
দাস-দুঃখ দেখি দামোদরে হৈল দয়া।
সর্ব্বথা সাক্ষাৎ হব, দিব পদ-ছায়া ॥

[নারায়ণ ফকিরের বেশে ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন।]

নিজ দুঃখ ক'য়ে দ্বিজ করেন রোদন।—
"নারিনু খাওয়াতে আমি অতি অভাজন ॥
মৃত্যুকালে মোর ধর্ম্ম মজাইলে মিছে।
ধর মোর বসন, অশন কর বেচে ॥"

[নারায়ণ ব্রাহ্মণের এই অপূর্ব্ব আতিথেয়তা দর্শনে পরম প্রীত হইলেন ও আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন,—

মক্কায় রহিম আমি, অযোধ্যায় রাম।]

আশ্বাস—সান্ত্বনা। বিবেগ—উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। মুষ্টি—মুষ্টিভিক্ষা। বাট—পথ। রিক্ত—শূন্য।

দাস-দুঃখ—দাসের অর্থাৎ ভক্তের দুঃখ। সর্ব্বথা—সর্ব্বপ্রকারে অর্থাৎ নিশ্চয়ই। অশন কর—আহার কর।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

[১৭১৮–১৭৭৫]

১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্টগ্রামে রামপ্রসাদ সেন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। কিন্তু শ্যামাভক্তির পবিত্র অমৃতধারায় যে হৃদয় নিত্য নিষিক্ত ছিল, সেখানে বৈদ্যকশাস্ত্রের পাঁচন-রস প্রবেশের স্থান পায় নাই। কেবল বৈদ্যকশাস্ত্র নহে, বিষয়-বাসনাও তাঁহার মন অধিকার করিতে পারে নাই। কথিত আছে, রামপ্রসাদ এক জমিদারের সেরেস্তায় মুহুরীগিরি করিতেন। রামপ্রসাদ হিসাবের খাতায় গান লিখিতেন। একদিন প্রভু রামপ্রসাদের খাতা পরীক্ষা করিতে আসিয়া দেখেন, রামপ্রসাদ তাহাতে এই গানটি লিখিয়াছেন—

আমায় দে মা তবিলদারী।
আমি নেমকহারাম নই শঙ্করি॥

ধনী এই সঙ্গীতপাঠে মুগ্ধ হইয়া রামপ্রসাদকে সঙ্গীত-রচনায় মনোনিবেশ করিতে উপদেশ দিলেন ও তাঁহার মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালী কবিদিগের পরম পৃষ্ঠ-

পোষক ছিলেন। তাঁহার সভা বাণীর বীণা-ঝঙ্কারে সর্ব্বদা ঝঙ্কৃত থাকিত। গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি প্রদান করেন ও একশত বিঘা ভূমি নিষ্কর দান করেন। ইহাতে কবির সাংসারিক অভাব বিদূরিত হয়।

রামপ্রসাদের শ্যামা-বিষয়ক গীতগুলি পদাবলী নামে অভিহিত হয়। এই পদাবলী ছাড়া, রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রভৃতি কয়েকখানি খণ্ড কাব্যও প্রণয়ন করেন।

উমার অভিমান

[মেনকা গিরিরাজ হিমালয়কে শিশু উমার অভিমানের কথা বলিতেছেন—]

গিরিবর ! আর আমি পারিনে হে,
প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান,
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥
অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী,
বলে উমা—"ধরে দে উহারে।"
কাঁদিয়ে ফুলাল আঁখি, মলিন এ মুখ দেখি,
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ?

অতি অবশেষ—প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

"আয় আয় মা মা" বলি, ধরিয়ে কর-অঙ্গুলি,
যেতে চায় না জানি কোথারে !
আমি কহিলাম তায়— "চাঁদ কিরে ধরা যায় ?"
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে ॥
উঠে বোসে গিরিবর, করি বহু সমাদর,
গৌরীরে লইয়া কোলে ক'রে।
সানন্দে কহিছে হাসি,— "ধর, মা, এই লও শশী,"
মুকুর লইয়া দিল করে ॥
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ,
বিনিন্দিত-কোটি-শশধরে ॥

হতাশের আক্ষেপ

[বিষয়-বাসনায় একান্ত নিমগ্ন ব্যক্তি, সমস্ত জীবন বৃথা অতিবাহিত হইয়াছে দেখিয়া, জীবন সন্ধ্যায় আক্ষেপ করিতেছে।]

বিনিন্দিত-কোটি-শশধরে—বিনিন্দিত হইয়াছে কোটি শশধর যে মুখ কর্ত্তৃক ; যে মুখের কাছে কোটি চন্দ্রও হারি মানে। মিলের অনুরোধে 'শশধরে' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে।

কেবল আসার আসা, ভবে আসা, আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে, ভ্রমর ভুলে র'লো॥
মা! নিম খাওয়ালে চিনি ব'লে
কথায় ক'রে ছল।
ওমা! মিঠার লোভে, তিতমুখে
সারাটা দিন গেল॥
মা! খেল্‌বি ব'লে, ফাঁকি দিয়ে
নামালে ভূতল।
এবার যে খেলা খেলালে, মাগো,
আশা না পূরিল॥
রামপ্রসাদ বলে, ভবের খেলায়.
যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলের ছেলে,
ঘরে নিয়ে চলো॥

কেবল আসার আসা ইত্যাদি—কেবল আসিতে অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করিতে হয় বলিয়াই এই পৃথিবীতে আমার নামমাত্র আসা হইল, প্রকৃত কোন কাজ হইল না।

যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ইত্যাদি—ভ্রমর যেমন চিত্রে অঙ্কিত পদ্মকে প্রকৃত পদ্ম মনে করিয়া মধুলোভে তাহাতে বসিয়া বৃথা সময় কাটায়, আমিও সেইরূপ এই অসার সংসারকে সার মনে করিয়া ইহাতেই নিমগ্ন হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছি।

কথায় ক'রে ছল—কথায় ভুলাইয়া। সন্তান পীড়িত হইলে, জননী 'চিনি খাও' বলিয়া ছলনা করিয়া তাহাকে তিক্ত দ্রব্য খাওয়ান; হে জননি! তুমিও আমাকে সেইরূপ ভুলাইয়া সংসারের তিক্ত রস পান করাইলে।

অভিমান ১

মা হওয়া কি মুখের কথা।

(কেবল প্রসব করে হয় না মাতা।)

যদি না বুঝে সন্তানের ব্যথা॥

দশ মাস দশ দিন, যাতনা পেয়েছেন মাতা।

এখন ক্ষুধার বেলা সুধালে না,

এল পুত্র গেল কোথা॥

সন্তানে কুকর্ম্ম করে, ব'লে সারে পিতামাতা।

দেখে কাল প্রচণ্ড করে দণ্ড,

তাতে তোমার হয় না ব্যথা॥

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, এ চরিত্র শিখলে কোথা।

যদি ধর আপন পিতৃধারা,

নাম ধরো না জগন্মাতা॥

এখন ক্ষুধার বেলা ইত্যাদি—তুমি সন্তানের প্রতি এমনি মমতাহীন যে, সে খাইল কি না খাইল, তাহার খোঁজ কর না। এ সংসারে আসিয়া আমি সুখে আছি কি দুঃখে আছি তাহা একবার চাহিয়াও দেখ না।

সন্তানে কুকর্ম্ম করে…ব্যথা—সন্তান কাহারও নিকটে দোষ করিলে, পিতামাতা নানা কথা বলিয়া তাহার অপরাধ সারিয়া লন, সন্তানকে দণ্ড হইতে রক্ষা করেন; কিন্তু তুমি এমনই মাতা যে প্রচণ্ড কাল সন্তানকে দণ্ড দিতেছে দেখিয়াও, তোমার মনে কষ্ট হইতেছে না।

যদি ধর আপন পিতৃধারা—তোমার পিতা পাষাণ; তুমিও যদি সেইরূপ পাষাণ-হৃদয় হও।

অভিমান ২

মা, মা, ব'লে আর ডাকিব না।

ওমা, দিয়েছ, দিতেছ কতই যন্ত্রণা॥

ছিলাম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী;

আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,

না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,

মা ব'লে আর কোলে যাব না॥

ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,

মা, কি র'য়েছ চক্ষু-কর্ণ খেয়ে,

মাতা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে,

মা ম'লে কি আর ছেলে বাঁচে না॥

ভণে রামপ্রসাদ, মায়ের কি এক সূত্র,

মা হ'য়ে হ'লি, মা, সন্তানের শত্রু,

দিবানিশি ভাবি, আর কি করিবি,

দিবি দিবি পুনঃ জঠর-যন্ত্রণা॥

ভণে—বলে। সূত্র—ছুতা; ক্রোধের কারণ।

দিবি দিবি পুনঃ ইত্যাদি—না হয় মুক্তি না দিয়া আবার মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করাইয়া কষ্ট দিবে।

সন্তানের গর্ব

এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস-তালুকে বসত করি॥

নাইকো জরিপ জমাবন্দি,
তালুক হয় না লাটে বন্দী,
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি,
শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী॥

এই গীতের ন্যায় রামপ্রসাদের অন্যান্য অনেক গানে জমিদারিসংক্রান্ত বিস্তর কথা আছে। কতকগুলি গীতে আইন-আদালত-সম্পর্কীয় কথাও আছে। পল্লীগ্রামে জায়গাজমি থাকিলেই জমিদার বা তাঁহার কর্ম্মচারীদিগের সংস্রবে আসিতে হয়। তাহার উপর রামপ্রসাদ কিছুদিন জমিদারি সেরেস্তায় কর্ম্মও করিয়াছিলেন।

মহেশ্বরী—(১) কালী, (২) সকলের রাণী। খাস তালুক—জমিদারের নিজের তালুক, যাহার জন্য তাঁহাকে আর কাহাকেও রাজস্ব দিতে হয় না। জরিপ—মাপ। জমাবন্দী—রাজস্ব ধার্য্য করা। লাটে বন্দী—ঠিক সময়ে খাজনা না দেওয়ায় প্রকাশ্য নীলামে জমি বিক্রয়। সন্ধি—মীমাংসার উপায়। শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী—জমিদারের কর্ম্মচারীরা অনেক সময় অত্যাচারী হয়; কিন্তু শ্যামা মায়ের জমিদারীর কর্ম্মচারী মঙ্গলময় উদার-হৃদয় স্বয়ং শিব।

নাইকো কিছু অন্য লেঠা,
দিতে হয় না মাথট, বাটা,
জয় দুর্গার নামে জমা আঁটা,
ঐটা করি মালগুজারি ॥
বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ,
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি,
ব্রহ্মময়ীর জমিদারী ॥

লেঠা—বিপদ। মাথট—বে-আইনী করিয়া যে কর আদায় করা হয়। বাটা—ক্ষতিপূরণের টাকা। জমা আঁটা—খাজনা ঠিক করা আছে, জমিদারের ইচ্ছামত তাহার হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। মালগুজারী খাজনা জমা দেওয়া।

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর

[১৭১২-১৭৬০]

ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত পেঁড়ো বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ভুরস্থট পরগণার জমিদার ছিলেন; পরে বর্দ্ধমানাধিপতির সহিত বিবাদে হৃত-সর্ব্বস্ব হন।

ভারতচন্দ্র সংস্কৃত ও পরে ফার্শী ভাষা শিক্ষা করেন। একবার রাজস্বপ্রদানার্থ বর্দ্ধমানে যাইয়া কোন কারণে কারারুদ্ধ হন। কোন প্রকারে কারাগার হইতে উদ্ধার পাইয়া, শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। এ সময়ে তাঁহার মনে সংসার-বৈরাগ্যের উদয় হয়, এবং তিনি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন।

কিছুকাল পরে তাঁহার এই বৈরাগ্য দূর হয়, এবং তিনি ফরাশডাঙ্গার দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই দেওয়ান মহাশয়ের চেষ্টায় ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পরিচিত হন। গুণমুগ্ধ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে সভাকবি নিযুক্ত করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতচন্দ্র 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।

তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবিগণের ভাষা অনেক স্থানে মার্জ্জিত

ছিল না; তাঁহাদিগের ছন্দেও পদে পদে নিয়মভঙ্গ দৃষ্ট হইত। এজন্য পরবর্ত্তী সম্পাদকগণ কর্তৃক তাঁহাদিগের ভাষা ও ছন্দঃ সংশোধিত হইয়াছিল।

কিন্তু ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দঃ সর্ব্বপ্রকারে দোষশূন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাষার লালিত্যে পাঠকের হৃদয় মুগ্ধ হয়। সমস্ত কাব্যে অধম মিলের উদাহরণ দুই চারিটি মাত্র পাওয়া যায়। শব্দ-সম্পদে ভারতচন্দ্র একজন অদ্বিতীয় কবি ছিলেন।

ভাব ও কাব্যবর্ণিত বিষয়ে ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যে অনেক স্থলে কবিকঙ্কণের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। লোক-চরিত্র-চিত্রণে ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কবিকঙ্কণ শ্রেষ্ঠ। কবিকঙ্কণের সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবের পরিবর্ত্তে ভারতচন্দ্রের চরিত্রগুলি যেন কৃত্রিমতায় আড়ষ্ট। ভারতচন্দ্রের রুচিও অনেক স্থলে আধুনিক সমাজের প্রীতিকর নহে।

প্রাচীন বাঙ্গালা কবিগণের কাব্যে কতকগুলি সাধারণ বিষয় বর্ণিত হইত। যথা—(১) গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবদেবীগণের বন্দনা, (২) গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, (৩) প্রায়ই হরগৌরীর বিবাহ, (৪) নারীগণের পতিনিন্দা, (৫) বারমাস্যা অর্থাৎ গ্রন্থোক্ত কোন পাত্রীর বারমাসের সুখদুঃখের কথা, ইত্যাদি। এই সমস্ত বর্ণনা সকল কাব্যেই প্রায় একপ্রকার; পরবর্ত্তী কবি অনেক সময়, অল্পাধিক পরিবর্ত্তন সহ, পূর্ব্ববর্ত্তী কবির ভাষা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যেও এ সমস্তই দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, কবিগণ দেবদেবীদিগকে তত্তৎকালের সমাজের ছাঁচে ঢালিয়া গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা একটি বিষয়ে সাবধান হইতেন। কোন দেবতার নিন্দা করিতে হইলে তাহা দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় প্রকাশ করিতেন—এক পক্ষে নিন্দা, অপর পক্ষে স্তুতি। এইরূপ বর্ণনায় ভারতচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

শিবের ভিক্ষায় গমন

[শিবের অভাবের সংসার। কাজেই হর ও গৌরীর মধ্যে প্রায়ই কোন্দল হয়। একদিন শিব দুঃখ করিয়া নানা কথার পর বলিলেন—

কিবা শুভক্ষণে হইল অলক্ষণ ঘর।
খাইতে না পেনু কভু পূরিয়া উদর॥
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা॥

শুনিয়া গৌরীর ক্রোধ হইল। তিনি উত্তর করিলেন—

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালী ধন কই॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা, অঙ্গ গেল ফেটে॥

পত্নীর তিরস্কারে লজ্জিত হইয়া শিব ভিক্ষায় চলিলেন।]

"ভবানীর কটুভাষে, লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে,
ক্ষুধানলে কলেবর দহে।
বেলা হৈল অতিরিক্ত, পিত্তে হৈল গলা তিক্ত,
বৃদ্ধ লোকে ক্ষুধা নাহি সহে॥
হেঁটমুখে পঞ্চানন, নন্দীরে ডাকিয়া কন,
বৃষ আন যাইব ভিক্ষায়।
আন শিঙ্গা, হাড়মাল, ডমরু, বাঘের ছাল,
বিভূতি লেপিয়া দেহ গায়॥
ঘর উজাড়িয়া যাব, ভিক্ষায় যা পাই খাব,
অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস।
নারী যার স্বতন্তরা, সেজন জীয়ন্তে মরা,
তাহারে উচিত বনবাস॥
বৃদ্ধকাল আপনার, নাহি জানি রোজগার,
চাষবাস বাণিজ্য ব্যাপার।
সকলে নির্গুণ কয়, ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়,
নামমাত্র রহিয়াছে সার॥

কৃত্তিবাস—কৃত্তি অর্থাৎ চর্ম্ম হইয়াছে বাস যাঁর; মহাদেব। বিভূতি—ভস্ম। উজাড়িয়া—শূন্য করিয়া। স্বতন্তরা—স্বাধীনপ্রকৃতি। নির্গুণ—(১) গুণহীন, (২) গুণাতীত। ভুলায়ে সর্ব্বস্ব লয়—(১) আমাকে বোকা বুঝাইয়া সব লয়, (২) আমাকে ভক্তিতে ভুলাইয়া যাহা চায় তাহাই লইয়া থাকে।

যত আনি তত নাই, না ঘুচিল খাই খাই,
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর, আরোহিলা বৃষোপর,
চলিলেন ভিক্ষার লাগিয়া॥
শিবের দেখিয়া গতি, শিবা কন ক্রোধমতি,
কি করিব একা ঘরে র'য়ে।
বৃথা কেন দুঃখ পাই, বাপের মন্দিরে যাই,
গণপতি, কার্ত্তিকেয় লয়ে॥
যে ঘরে গৃহস্থ হেন, সে ঘরে গৃহিণী কেন,
নাহি ঘরে সদা খাই খাই।
কি করে গৃহিণীপনে, খন্ খন্ ঝন্ ঝনে
আসে লক্ষ্মী বাস বান্ধে নাই॥
হইয়া বিরস-মন, ল'য়ে গুহ গজানন,
হিমালয়ে চলিলা অভয়া।
ভারত বিনয়ে কয়, এমত উচিত নয়,
নিষেধ করিয়া কহে জয়া॥

নাহি ঘরে সদা খাই খাই—যে গৃহে অভাব, সেই গৃহেই লোকে সর্ব্বদা খাই খাই করিয়া থাকে। খন্ খন্ ঝন্ ঝনে—কলহে। বাস বান্ধে নাই—স্থায়ী হয় না। গুহ—কার্ত্তিকেয়। জয়া—গৌরীর সখী।

অন্নদার ভবানন্দ-ভবনে যাত্রা

[অন্নদার শাপে কুবেরের অনুচর বসুন্ধর এক দরিদ্র কায়স্থের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইল হরি হোড়। অন্নপূর্ণার কৃপায় দরিদ্র হরি হোড় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন। হরি হোড় একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন। তাহার ফলে গৃহে নিত্য কলহ আরম্ভ হইল। সেই ছল পাইয়া অন্নপূর্ণা হরি হোড়ের গৃহ ত্যাগ করিয়া ভবানন্দ মজুমদারকে কৃপা করিতে চলিলেন।

হরি হোড়ের বাড়ী গাঙ্গিনীর (গঙ্গার শাখানদী) পশ্চিম পারে বড়গাছি গ্রামে ছিল, আর ভবানন্দের বাড়ী পূর্ব্বকূলে আন্দুলিয়া গ্রামে ছিল। অন্নপূর্ণা, স্ত্রীলোকের বেশ ধারণ করিয়া, নদী পার হইবার জন্য তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এই কবিতাটি দ্ব্যর্থবোধক।]

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
"পার কর"—বলিয়া ডাকিল পাটনীরে॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি॥

ভবানন্দ মজুমদার—কৃষ্ণনগরের রাজবংশের আদি পুরুষ। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। এইজন্য ভবানন্দ মজুমদারের প্রতি অন্নদার কৃপার কথা বর্ণনা করিয়াছেন।

পাটনী—খেয়া-মাঝি।

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী।—
"একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি, কি জান কে দিবে ফেরফার্॥"
ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।—
"বুঝহ, ঈশ্বরী, আমি পরিচয় করি॥
বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ-জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি, তেঁই পতি মোর বাম॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি, সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি, তাঁর কপালে আগুন॥

দিবে ফেরফার—বিপন্ন ঘটাইবে। বিশেষণে—চিহ্ন বা গুণের দ্বারা। গোত্রের প্রধান—(১) শ্রেষ্ঠ গোত্রে জাত, (২) পর্ব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ হিমালয়।

মুখবংশ—(১) মুখোপাধ্যায় বংশ, (২) শ্রেষ্ঠ বংশ।

বন্দ্যবংশ—বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, (২) পূজনীয় বংশ।

পিতামহ—(১) ঠাকুরদাদা, (২) ব্রহ্মা। অনেকের পতি—(১) অনেক বিবাহ করিয়াছেন, (২) জগৎপতি। বাম—(১) বিরূপ, (২) মহাদেব। অতিবড়..... নিপুণ—(১) আমার স্বামী খুব বুড়া ও সিদ্ধি খাইতে খুব পটু, (২) আমার স্বামী সকলে বড় ও লোককে সাফল্য দানে তৎপর। কোন গুণ নাই—(১) নিগুণ, (২) গুণের অতীত। কপালে আগুন--তাঁর কপালে আগুন দিই, (২) তাঁহার কপালে অনল আছে, অর্থাৎ মহাদেব।

কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা, তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন-স্বরূপা সে স্বামীর শিরোমণি ॥
ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে।
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে ॥
অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিলা ভাই।
যে মোরে আপনা ভাবে তারই ঘরে যাই ॥"

কুকথায় পঞ্চমুখ—(১) গালি দিবার সময় তিনি যেন পাঁচমুখে কথা কহেন, (২) তাঁহার পঞ্চমুখে বেদ উচ্চারিত হয়। কণ্ঠভরা বিষ—(১) তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত বাক্য বিষময়, (২) সমুদ্রমন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল, জগতের মঙ্গলার্থে তিনি তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়াছেন। দ্বন্দ্ব—(১) কলহ, (২) উভয়ে একভাবে অবস্থিতি। তরঙ্গ—(১) যৌবনের চাঞ্চল্য বা লীলা, (২) ঢেউ। জীবন-স্বরূপা—আমার স্বামী তাহাকে প্রাণের মত ভালবাসেন, (২) জলময়া। ভূত নাচাইয়া—(১) আমার স্বামী ভূত নাচাইয়া বেড়ান, (২) আমার স্বামীর ইঙ্গিতে সমস্ত ভূত অর্থাৎ প্রাণী পরিচালিত হইতেছে। না মরে পাষাণ বাপ—(১)আমার বাপ পাষাণের মত নিষ্ঠুর, তিনি মরিলে বাঁচি, (২) আমার পিতা অমর হিমালয় পর্ব্বত। অভিমানে··· ভাই—(১) আমার পিতা এমন অপাত্রে আমাকে দান করায় আমার ভাই দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে, (২) আমার ভ্রাতা মৈনাক ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজয়ের আশঙ্কায় সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে। এ বিষয়ে পুরাণের উক্তি এই—পূর্ব্বে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছিল এবং তাহারা উড়িয়া বেড়াইত। ইন্দ্র তাহাদিগের পক্ষচ্ছেদ করায় তাহারা অচল হইয়া রহিয়াছে। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৈনাক পক্ষচ্ছেদের আশঙ্কায় সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আত্মরক্ষা করে।

যে মোরে আপনা ভাবে—(১) যে আমাকে স্নেহযত্ন করে, (২) যে ভক্তিদ্বারা আমাকে আপনার করিয়া লয়।

পাটনী বলিছে—"আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥
শীঘ্র আসি নায়ে চড়, দিবা কিবা বল।"
দেবী কন—"দিব, আগে পারে ল'য়ে চল॥"
বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা, নদীতে ফুটিল কোকনদ॥
পাটনী বলিছে,—"মাগো, শুন নিবেদন।
সেঁউতী উপরে রাখ ও রাঙ্গা চরণ॥"
পাটনীর বাক্যে মাতা হাসিয়া অন্তরে।
রাখিলা দুখানি পদ সেঁউতী উপরে॥
সেঁউতীতে পদ দেবী রাখিতে রাখিতে;
সেঁউতী হইল সোনা দেখিতে দেখিতে॥
সোনার সেঁউতী দেখি পাটনীর ভয়।
এত মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়॥
তটে উত্তরিল তরী, তারা উত্তরিলা।
পূর্ব্বমুখে সুখে গজ-গমনে চলিলা॥
সেঁউতী লইয়া কক্ষে চলিল পাটনী।
পিছে দেখি তারে দেবী ফিরিলা আপনি॥
সভয়ে পাটনী কহে, চক্ষে বহে জল।—
"দিয়াছ যে পরিচয় বুঝিনু সে ছল॥

সেঁউতী—জল সেচিবার পাত্র। তারা—গৌরী।

হের দেখ সেঁউতীতে থুয়েছিলা পদ।
কাটের সেঁউতী মোর হৈলা অষ্টাপদ॥
ইহাতে বুঝিনু তুমি দেবতা নিশ্চয়।
দয়ায় দিয়াছ দেখা দেহ পরিচয়॥"
ছাড়াইতে নারি দেবী কহিলা হাসিয়া।—
"কহিয়াছি সত্য কথা, বুঝহ ভাবিয়া॥
কতদিন ছিনু হরি হোড়ের নিবাসে।
ছাড়িলাম তার বাড়ী কোন্দলের ত্রাসে॥
ভবানন্দ মজুমদার-নিবাসে রহিব।
বর মাগ মনোনীত যাহা চাহ দিব॥"
প্রণমিয়া পাটনী কহিছে যোড হাতে।—
"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥"
তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।—
"দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান॥"

অষ্টাপদ—সোনা।

যুগ-সন্ধি

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

[১২১৮—১২৬৫]

আমরা এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কবির রচনা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাঁহাদিগের কাহারও উপর ইংরাজী শিক্ষার কিছুমাত্র প্রভাব ছিল না। তাঁহারা পল্লীগ্রামে বাস করিতেন। তাঁহাদিগের কাব্যে পল্লীগ্রামের বাঙ্গালী নরনারীর চরিত্রই চিত্রিত হইত; প্রাচীন বাঙ্গালা সমাজের আচার-ব্যবহার রীতি-নীতিই বর্ণিত হইত। এ হিসাবে তাঁহারা খাঁটী বাঙ্গালা কবি ছিলেন। প্রত্যেক কবির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকিলেও, রচনা-পদ্ধতিতে তাঁহারা চিরাচরিত পথেই চলিতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পল্লী-কবি ছিলেন না। তিনি ১২১৮ সালে কাঁচরাপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও, শৈশবেই কলিকাতায় মাতামহের আলয়ে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তদবধি প্রধানতঃ কলিকাতাতেই তিনি তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

তখন কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অতি সামান্য ইংরাজী শিখিয়া লোকে ইংরাজদিগের আপিসে চাকরি পাইত ও অর্থোপার্জ্জন করিত। ইংরাজীতে উচ্চশিক্ষা প্রদানের জন্যও কয়েকটি স্কুল কলেজ স্থাপিত

হইয়াছিল। সেই সমস্ত বিদ্যালয়ে ভদ্রলোকের সন্তানেরা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত পড়িতে যাইত। ইংরাজী সাহিত্যের অতুল ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া তাহারা বিমুগ্ধ হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র বাল্যকালে লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার স্বাভাবিক কবি-শক্তির প্রভাবে তিনি অল্পবয়সেই কবি-ওয়ালাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি কবির দলে গান বাঁধিয়া দিতেন। ক্রমে তিনি কলিকাতার তদানীন্তন ধনী ও শিক্ষিত সমাজের সহিত পরিচিত হন ও তখন লেখাপড়ার চর্চ্চা করেন। তিনি ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর-বংশের সহিত ঈশ্বরচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। সেই বংশের যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের উৎসাহে, ঈশ্বরচন্দ্র ১২৩৭ সালে "সংবাদ-প্রভাকর" নামে এক সংবাদপত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের যাবতীয় উৎকৃষ্ট কবিতা এই সংবাদ-প্রভাকরেই প্রকাশিত হয়। "সংবাদ-প্রভাকর" তদানীন্তন বাঙ্গালী-সমাজে এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্য অনেক বাঙ্গালী যুবকও ঈশ্বরগুপ্তের আদর্শে কবিতা রচনা করিতেন; তাঁহাদিগের কবিতা 'প্রভাকরে' মুদ্রিত হইত। দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ঈশ্বর গুপ্তের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। মধ্যে মধ্যে 'প্রভাকরে' এই শিষ্যগণের কবিতা-যুদ্ধ হইত। এক হিসাবে ঈশ্বরগুপ্তকে তখনকার বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্রাট্ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাঙ্গালা সমাজে তখন প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণতঃ ইংরাজী শিক্ষিত নবীন সম্প্রদায় বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গালা সমাজ ও হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি প্রকাশ্যে অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা ইউরোপীয় আচার-ব্যবহারের একান্ত পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। কেহ কেহ ধর্ম্মান্তর পর্য্যন্ত গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও, তাঁহাদিগের ভয়ে হিন্দু সমাজ অস্থির হইয়া উঠিল।

ঈশ্বর গুপ্ত নবীন সমাজকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করিতেন। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেই তাঁহার কবি-শক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। তিনি নবীন সম্প্রদায়ের হৃদয়ে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগের সৃষ্টি করিতে একান্ত প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন কবির রচনায় এই স্বদেশ-প্রীতিব ভাব দৃষ্ট হয় না।

পক্ষান্তরে, কবি প্রাচীন সমাজকেও রেহাই দেন নাই। প্রাচীন সমাজের সমস্ত 'মেকি' তিনি সকলের সমক্ষে ধরাইয়া দিতেন। তিনি হিন্দু সমাজের সংস্কার-সাধন করিবার জন্য হিন্দু-দিগকে বিশেষ করিয়া জেদ করিতেন। হিন্দু সমাজের উপরে তাঁহার আন্তরিক প্রীতি ও সহানুভূতি ছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত অসাধারণ শব্দকৌশলী ছিলেন। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন কবির ন্যায় তাঁহার কবিতায় অনুপ্রাস ও যমকের বিশেষ বাহুল্য দৃষ্ট হয়। এই দোষে তাঁহার রচনা স্থানে স্থানে অত্যন্ত দুর্ব্বোধ হইয়াছে।

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন—"যখন অনুপ্রাস যমকে মন না থাকে, তখন তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুল। যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই। তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন বিকার নাই—ইংরেজিনবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই,—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না, বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভাবনা নাই। কেবল ভাষা নহে—ভাবও তাই। ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা—দেশী ভাব প্রকাশ করেন।"*

প্রাচীন ও নবীনের সন্ধিস্থলে প্রাদুর্ভূত হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উপর এক অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাতৃভাষা

মায়ের কোলেতে শুয়ে উরুতে মস্তক থুয়ে
খল খল সহাস্য বদন ;
অধরে অমৃত ক্ষরে আধ আধ মৃদু স্বরে,
আধ আধ বচনরচন।

* বঙ্কিমচন্দ্র-প্রণীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত হইতে উদ্ধৃত।

কহিতে অন্তরে আশা, মুখে নাহি ফুটে ভাষা,
ব্যাকুল হয়েছ কত তায় ;
মা-মা-মা-মা-বা-ব্বা-বা-বা-আবো, আবো, আবা, আবা,
সমুদয় দেববাণী প্রায়।
ক্রমেতে ফুটিল মুখ, উঠিল মনের সুখ,
একে একে শিখিলে সকল ;
মেসো, পিসে, খুড়া, বাপ, জুজু, ভূত, ছুঁচা, সাপ,
স্থল, জল, আকাশ, অনল।
ভাল মন্দ জানিতে না, মলমূত্র মানিতে না,
উপদেশ শিক্ষা হ'ল যত ;
পঞ্চমেতে হাতে খড়ি, খাইয়া গুরুর ছড়ি,
পাঠশালে পড়িয়াছ কত।
যৌবনের আগমনে, জ্ঞানের প্রতিভা মনে,
বস্তুবোধ হইল তোমার ;
পুস্তক করিয়া পাঠ, দেখিয়া ভবের নাট,
হিতাহিত করিছ বিচার।
যে ভাষায় হ'য়ে প্রীত, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে ;
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরাল তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে।

নাট—নৃত্য, খেলা।

জন্মভূমি

জাননা কি জীব তুমি, জননী জনমভূমি,
যে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে ?
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে ?
ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার ।
শিবের কৈলাস ধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার ॥
মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর ;
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ।
ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া ।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥

উপসর্গ সার—বিড়ম্বনা মাত্র। শিবপূর্ণ—মঙ্গলময়। শিবধাম—মঙ্গলের আলয়।

দেশের আচার মতে, চল সত্য ধর্ম্মপথে,
সুখে কর জ্ঞান-আলোচন ;
বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যা বিতরণ।

কুরীতি-সংস্কার

ভারতভূমির মাঝে হিন্দু আছ যত।
অলস অবশ হ'য়ে রবে আর কত ?
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুম, করিছ শয়ন ?
এখনো র'য়েছ সবে মুদিয়া নয়ন ?
ভবের কি ভাব তাহা কর অনুভব।
একবার চোখ মেলে, চেয়ে দেখ সব ॥
কি হইবে মিছা আর নিদ্রায় রহিলে ?
এখনি রতন পাবে যতন করিলে ॥
কি করিলে ভাল হয় কর বিবেচনা।
স্বদেশের হিতাহিত কর আলোচনা ॥
মনে মনে স্থিরভাবে কর প্রণিধান।
যাহাতে দেশের হয় কুশল-বিধান ॥

কুরীতি-কণ্টকবন করিয়া ছেদন।
সুরীতির সুখতরু করহ রোপণ॥
অনুরত হ'য়ে দেও অনুরাগ-জল।
শাখীর শাখায় হবে সুশোভিত দল॥
পরস্পরে এক হ'য়ে এক কথা বল।
একমতে একরথে একপথে চল॥
সকলেই একভাবে এক হই যদি।
এখনি শুকায়ে দিব ভ্রমময়ী নদী॥
আর না চালাতে হবে অধর্ম্মের পোত।
একেবারে হবে রোধ অজ্ঞানের স্রোত॥

অনুরাগ-জল—প্রীতি-বারি। দল—পত্র।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

[১২৩৪-১২৯৪]

প্রাচীন ও নবীনের সন্ধিস্থলে যে কয়জন বাঙ্গালী কবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের পরই রঙ্গলালের নাম কীর্ত্তনীয়। রঙ্গলাল ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন।

কোন সভায় জনৈক ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি তদানীন্তন বাঙ্গালা কবিতার নিন্দা করিয়া বলেন—"বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।" বঙ্গকবিতার এই দুর্নাম ঘুচাইবার জন্য রঙ্গলাল নূতন প্রণালীতে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

দেব-দেবীগণের বা তাঁহাদের বরপুত্রগণের পরিবর্ত্তে, রাজপুত বীর ও বীরাঙ্গনাগণের মধ্য হইতে রঙ্গলাল তাঁহার কাব্যের নায়ক-নায়িকা নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। পুরাণ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, তিনি তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিবার জন্য, রাজস্থানের ইতিহাসের শরণ লইয়াছিলেন। ইহার কারণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"পুরাণবর্ণিত উপাখ্যানগুলির মধ্যে অনেক অলৌকিক বর্ণনা থাকায়, অধুনাতন কৃতবিদ্য যুবকদিগের সে সমস্ত শ্রদ্ধার্হ নহে। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্ম্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্গুণা-

লঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগের পত্নী-গণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্বদেশীয় লোকের কীর্ত্তিকাহিনী আশু লোকের চিত্ত আকর্ষণ করে, এই বিবেচনায় রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন করিয়াছি।...আমি সর্ব্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্য্যালোচনা করিয়াছি, এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।"

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় যে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির উন্মেষ দেখা যায়, রঙ্গলালের কাব্যে তাহা পরিস্ফুট হইয়াছে।

তাঁহার কাব্যের ভাষা মার্জ্জিত। তবে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাবের নিদর্শনস্বরূপ তাহাতে অনুপ্রাসের বাহুল্য দৃষ্ট হয়।

তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ পদ্মিনী উপাখ্যান ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কর্ম্মদেবী, শূরসুন্দরী প্রভৃতি তাঁহার আরও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ আছে।

চিতোরের প্রাকৃতিক শোভা

['পদ্মিনী'র সূচনা হইতে এই অংশ গৃহীত।]

নবীন ভাবুক এক ভ্রমণ-কারণ।
ভারতের নানাদেশ করি' পর্য্যটন ॥
অবশেষে উপনীত রাজপুতনায়।
বসুধা বেষ্টিত যার কীর্ত্তি-মেখলায় ॥

ভ্রমি বহু রাজপুরী সানন্দ-অন্তরে।
প্রবেশেন একদিন চিতোর নগরে ॥
দেখেন অচল এক অতি উচ্চতর।
তার নিম্নে শোভা করে সুন্দর নগর ॥
গিরিপরে শোভে গড়, প্রাচীরে বেষ্টিত।
রাজচক্রবর্ত্তী-হিন্দু-সূর্য্য-প্রতিষ্ঠিত ॥
ধরাধর-অঙ্গে শোভে নানা তরুবর।
নয়নের প্রীতিকর ওষধি বিস্তর ॥
কোন স্থলে মৃদুস্বর করি নিরন্তর।
উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর ॥
তরুণ-অরুণ-ভাতি জ্বলে কোন স্থলে।
প্রবালের বৃষ্টি যেন হতেছে অচলে ॥
কোথাও তটিনীকুল কুল কুল স্বরে।
শেখরের শ্যাম অঙ্গে চারু শোভা করে ॥
যেন রঘুপতি-হৃদে হীরকের হার।
ভানুকরে ঝলমল করে অনিবার ॥
বিবিধ বিহঙ্গে নানা স্বরে করে গান।
সন্তাপীর তাপ দূর, হরে মন প্রাণ ॥

রাজচক্রবর্ত্তী-হিন্দু সূর্য্য—রাণা প্রতাপাদিত্য।

বীর বালক

[দিল্লীর পাঠান-সম্রাট্ আলাউদ্দীনের সহিত রাণা ভীমসিংহের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে বীর বালক বাদল যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিল, তাহার বর্ণনা।]

এখানেতে দিল্লীর সম্রাট্,
সঙ্গে অগণিত সৈন্যঠাট,
যেন পঙ্গপালদল, ছাইল সকল স্থল,
কিবা মাঠ, কিবা ঘাট, বাট।

রাজপুত-সেনানী হাজার,
পদাতিক চারিগুণ তার,
শত্রুসংখ্যা অগণন, তাহাতে সম্মুখ রণ
কতক্ষণ করিবেক আর ?

অরুণ-উদয়ে তারাগণ,
একে একে অদৃশ্য যেমন ;—
সেরূপ ক্ষত্রিয়গণে, যুদ্ধ করি প্রাণপণে
ক্রমে ক্রমে হইল পতন।

চিতোরের সেনানী-প্রধান,
গোরা নামে খ্যাত মতিমান্,
বিনাশি সহস্র অরি, খর শর-শয্যা'পরি
ভীষ্মপ্রায় ত্যজিলেন প্রাণ।

তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র গুণধর,
দ্বাদশবর্ষীয় বীরবর ;
বাদল তাহার নাম, অপূর্ব্ব-বীরত্ব-ধাম,
যুদ্ধ করে অতি ঘোরতর।

সঙ্গে মাত্র নাহি সহচর,
সমর করিছে একেশ্বর,
নাহি স্থান-নিরূপণ, বরিষয়ে প্রহরণ,
যথা দেখে অরাতি-নিকর।

হেরি দিল্লীপতি ক্রোধে জ্বলে,
উপনীত হ'য়ে রণস্থলে ;
মুখে শব্দ "মার মার," বাদলের চারিধার,
ঘেরিল অগণ্য সৈন্যদলে।

বাদলের বারিধারা প্রায়,
পড়ে অস্ত্র বাদলের গায়।
বর্ম্মে চর্ম্মে ঠেকে বাণ, হয়ে শত শত খান,
অবিরত পড়িছে ধরায়।

একে শরাঘাতে হতবল,
তাহে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় চঞ্চল ;
সর্ব্বাঙ্গে রুধির ঝরে, ললাটেতে স্বেদ ক্ষরে,
বিকল হইল সৈন্যদল।

৯

বীরশিশু সাহসে যুঝিয়া,
উপযুক্ত সময় বুঝিয়া,
জীবনাশা পরিহরি, একদিক্ লক্ষ্য করি,
আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া।

ব্যূহভেদ করি' শিশু ধায়,
তিমিরে অলক্ষ্য তার কায় ;
অতিশয় ক্লান্ত দেহে, যেমন প্রবেশে গেহে,
মূর্চ্ছাগত অমনি ধরায়।

হেরি পুরবাসিনী সকলে,
'হায় কি হইল' সবে বলে।
বাদলের মাতা আসি, নয়নের জলে ভাসি,
ধূলায় লুটায় সেই স্থলে।

কতক্ষণ গত এ প্রকারে,
মোহ-ত্যাগ করায় তাহারে।
প্রকাশি নয়নাম্বুজ, প্রসারিল দুই ভুজ,
জননীর কোলে যাইবারে।

ভারতের সমৃদ্ধি

['কর্ম্মদেবী' হইতে গৃহীত। যশলমীরের অন্তঃপাতী পুগল-দেশের রাজপুত্র সাধু পাঠান বণিক্‌গণের নিকট ভারতের সমৃদ্ধির বর্ণনা করিতেছেন।]

মোদের ভারতভূমি লক্ষ্মীর আবাস।
কত শস্য জন্মে হেথা বিহনে প্রয়াস॥
রসাল রসাল ফল কিবা তুল্য তার।
সিন্ধু-মথা সুধা চেয়ে মিষ্ট তার তার॥
আর এক ফল ফলে শূন্যের উপর।
অপূর্ব্ব সলিলে পূর্ণ তাহার উদর॥
এমন শীতল মিষ্ট কোথা আছে নীর?
পানমাত্র তৃষিতের জুড়ায় শরীর॥
কিবা শস্য সুমধুর আস্বাদে উল্লাস।
পথিকের শ্রান্তি-ক্লান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নাশ॥
আর এক ফল আছে নাম আনারস।
নন্দন-কানন থেকে বুঝি আনা রস॥
এইরূপ কতরূপ এদেশের ফল।
বিশেষিয়া বাহুল্য বর্ণন সে সকল॥

তার—স্বাদ। বিশেষিয়া ইত্যাদি—বিশেষ করিয়া সে সমস্ত বর্ণনা করিতে গেলে বাহুল্য দোষ ঘটিবে।

আনিয়াছ বসন, সুগন্ধ সঙ্গে যাহা।
এ দেশের দুর্লভ কিছুই নহে তাহা॥
ঢাকা কাশ্মীরের তন্ত্রে কি শিল্প-চাতুরী।
অপরূপ শোভাগুণে মন করে চুরি॥
এই দেশে কুঙ্কুম, কস্তূরী, মৃগমদ।
এই দেশে কালাগুরু, চন্দন বিশদ॥
এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, জায়ফল।
জয়িত্রী, কর্পূর, চুয়া, পূগ আদি ফল॥
এরূপ অনেক দ্রব্য জনমে এদেশে।
পূর্ব্ব পয়োধির দ্বীপ-মালায় বিশেষে॥
সেই সব অপূর্ব্ব সুগন্ধ দ্রব্যচয়।
ভারতের নানা হাটে স্তূপে স্তূপে রয়॥
ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে।
জগতে সর্ব্বত্র ইহা খ্যাত ভালমতে॥

তন্ত্র—তাঁত। মৃগমদ—কস্তূরী। কালাগুরু—কৃষ্ণচন্দন। বিশদ—শ্বেত। পূগ—সুপারি। পূর্ব্ব-পয়োধি—পূর্ব্ব সমুদ্র।

দ্বারকানাথ অধিকারী

[১২৩৭-১২৬৪]

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গোস্বামি-দুর্গাপুর গ্রামে ১২৩৭ সালে দ্বারকানাথ অধিকারীর জন্ম হয়। ইঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। যথারীতি গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া, দ্বারকানাথ অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশ করেন।

দ্বারকানাথ বাল্যকাল হইতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিতেন। তাঁহার একটি কবিতা পাঠ করিয়া তদানীন্তন কবি-সম্রাট্ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহাকে কবিতা-রচনায় উৎসাহিত করেন। তদবধি "সংবাদ-প্রভাকরে" দ্বারকানাথের কবিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে পরবর্ত্তী কালের প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র হিন্দু কলেজের ও বঙ্কিম বাবু হুগলি কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাঁহারাও "প্রভাকরে" কবিতা লিখিতেন। "প্রভাকরে" প্রায় একবৎসর ধরিয়া দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা-যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে অনেকেই দ্বারকানাথের জয়ঘোষণা করিয়াছিলেন।

১২৬২ সালে দ্বারকানাথ তাঁহার কতকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া "সুধীরঞ্জন" নামে এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১২৬৪ সালে

মাত্র সাতাইশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য-শিষ্যগণের মধ্যে দ্বারকানাথের উপরেই তাঁহার প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকগণের মাতৃভাষার প্রতি অনাদর দর্শন করিয়া দ্বারকানাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইতেন। উদ্ধৃত কবিতায় তাঁহার এই মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা ও ইংরাজী ভাষা

[একদিন সন্ধ্যার সময়, কয়েকজন ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক তাহাদের বিদ্যালয়-সংলগ্ন মাঠে বেড়াইতেছিল। এমন সময় এক রমণী "কাঙ্গালিনীর বেশে বিষণ্ণ বদনে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আপনার হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক যুবাদলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—সন্তান সকল, আমার ক্রোড়ে আইস; বহুদিনাবধি আমি তোমাদিগের কমলানন নিরীক্ষণ না করিয়া মৃতবৎ হইয়াছি; তোমরা কি পরের মাকে মা বলিয়া এ দুঃখিনীকে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছ?" নব্য সম্প্রদায় সেই কাঙ্গালিনীর মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়া সে স্থান হইতে পলায়ন করিল ও ইংরাজী-ভাষা-জননীর নিকট উপস্থিত হইল। তাহাদের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, ইংরাজী ভাষা সেই কাঙ্গালিনীর সন্ধানে বহির্গত হইলেন ও তাঁহার দর্শন পাইলেন। তখন

উভয়ের মধ্যে এই কথোপকথন হইল। সেই কাঙ্গালিনী—সন্তানগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা বঙ্গ-ভাষা।]

ইংরাজী ভাষা। কে তুমি, কাহার নারী, হেথা কি কারণ।
স্বরূপ করিয়া বল স্বীয় বিবরণ॥
নয়নে হেরিয়া, ধনি, তব অবয়ব।
ভদ্রের রমণী মনে হয় অনুভব॥
তোমারে দেখিয়া বাঙ্গালীর সুতচয়।
পলাইতেছিল যবে মনে পেয়ে ভয়॥
কাহার কথায় তুমি বাড়াইয়া হাত।
ধরিবারে গিয়াছিলে তাদের পশ্চাৎ॥

বঙ্গভাষা। বঙ্গদেশে বাস করি বারমাস,
বাঙ্গালীর মাতৃ-ভাষা।
যতেক তোমার, দোভাষী কুমার,
তাদের দেখিতে আসা॥
শুনি—সুতগণে হেরিয়া নয়নে
তোমার মোহিনী বেশ।
অলঙ্কার-আশে, থাকে তব পাশে,
আমার কপালে দ্বেষ॥

ধনি—হে সুন্দরি। দোভাষী—যাহারা ইংরাজী ও বাঙ্গালা এই উভয় ভাষায় কথা কয়।

পুত্র-আচরণ করিলে স্মরণ,
মরণ-বাসনা হয়।
তারা কি না ছলে, সবাকারে বলে,—
বঙ্গভাষা ভাষা নয়॥

ইংরাজী ভাষা। জানিলাম, বাঙ্গালীর তুমি মাতৃভাষা।
এখানে হয়েছে তব অকারণ আসা॥
জাননা তোমার যত নবীন নন্দন।
নিত্য লাভ করিতেছে জ্ঞানরূপ ধন॥
সহজে তোমার দশা হেরিয়া নয়নে।
মা বলিতে সবাকার ঘৃণা হয় মনে॥

বঙ্গভাষা। ভাল জ্ঞান, সুলোচনা, করিতেছে আলোচনা,
আমার নবীন সুত সবে।
দেখিলে মলিন বাস, না যাবে মায়ের বাস,
ঘৃণা করি কটু কথা কবে॥
দেখে মোরে বাঙ্গালিনী, ভাবিয়াছ কাঙ্গালিনী,
কিন্তু আমি কাঙ্গালিনী নই।
যদ্যপি যুবক-দলে, জননী জননী বলে,
অপমান নাই মান বই॥
গাহিয়া যাহার যশ, সমীরণ দিক্ দশ,
সদাকাল করিছে ভ্রমণ।
বসুমতী, গ্রহচয়, তপন হইলে লয়,
যার নাম না হবে পতন॥

সে রামমোহন রায়, লোকে রাজা বলে যায়,
মা বলিয়া আমারে ডাকিত।
নানা অলঙ্কার দিয়া, মন-সুখে সাজাইয়া,
অনুক্ষণ যতনে রাখিত ॥
অজ্ঞান-তিমিরে রবি, শ্রীরামপ্রসাদ কবি,
ভারতে ভারত মহোদয়।
লোকের নয়ন-তারা, কবির ভূষণ যারা,
তারা সব আমার তনয় ॥

ইংরাজী ভাষা। না দেখিয়া অপরাধ, কিসের কারণ।
দোভাষী সন্তানে দোষ করিছ অর্পণ ॥
আর আর তোমার প্রাচীন সুত যত।
তব বিপরীত কর্ম্মে অবিরত রত ॥

বঙ্গভাষা। শুনিয়াছি—তুমি সতী, অতিশয় গুণবতী,
সদাকাল মতি পরহিতে।

রামমোহন রায়—(খ্রীঃ ১৭৭৪-১৮৩৩) ইনি একজন সমাজ-সংস্কারক ও অসাধারণ ধীশক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। দিল্লীর নামমাত্রাবশেষ সম্রাট্ দ্বিতীয় আকবর সাহ ইঁহাকে 'রাজা' উপাধি দেন ও বিলাতে পাঠান। বিলাতে ও ফ্রান্সে ইনি বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে ব্রিষ্টল নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত বাঙ্গালা গদ্যে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। ইঁহার রচিত ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিও অতি মধুর।

তব বিপরীত কর্ম্মে—তোমার অহিতকর কার্য্যে।

তবে কি কারণে কহ, প্রাচীন সুতের সহ,
নূতনের তুলনা করিতে ॥
ভাবিয়া দেখ না মনে, যারা কভু সযতনে,
করে নাই বাণীর অর্চ্চনা।
তারা কি কখনও পারে দুঃখদল দলিবারে,
পূরাইতে মনের কামনা ॥
আপনি প্রাচীন কালে, ছিলে গো কিরূপ হালে,
মনে কি পড়ে না একবার।
জ্ঞানী সুত বিনা কেবা, যতনে করিয়া সেবা,
পরাইল এত অলঙ্কার ॥

ইংরাজী ভাষা। যদি থাকে অভিলাষ, গৌরবে করিতে বাস,
কুভাষ ব'লনা আর মুখে।
আমি দিব ব'লে ক'য়ে, যতনে তোমারে ল'য়ে,
যুবাদল রাখিবেক সুখে ॥

বঙ্গভাষা। ভয় নাহি করি এক তিলের কারণ।
বেঁচে থাক আমার প্রাচীন পুত্রগণ ॥
যদিও গো জ্ঞানধন নাহি সবাকার।
অনেকে পারিবে মন তুষিতে আমার ॥

ইংরাজী ভাষা। কিছুই বলিতে নারি, তুমি কি ভাবের নারী,
কে বুঝিবে তব আচরণ।
পরিহরি' সুধাকর, জুড়াইতে কলেবর,
খদ্যোতের নিয়াছ শরণ ॥

বঙ্গভাষা। কি ভয় দেখাও তুমি আর বার বার।
চাঁদে কি করিবে, প্রিয় প্রভাকর যার॥
সে যদি আপন কর না করে প্রকাশ।
শশী কি কখন পারে শোভিতে আকাশ॥
কি কারণে তোষামোদ করিব সকলে।
পিপাসা যাবে না কভু গোষ্পদের জলে॥
বিশেষতঃ বারি বিনা কিছু নাহি ডর।
একাকী ঈশ্বর মম বিদ্যার সাগর॥
তার যদি জননীর প্রতি থাকে টান।
ত্বরায় উঠিবে মম যশের তুফান॥
কালে না পারিবে কিছু করিতে আমার।
পেয়েছি কপালগুণে অক্ষয়কুমার॥
তাহার বাসনা সবে শুনিবারে পায়।
অক্ষয় যশের মালা পরাইবে মায়॥

ইংরাজী ভাষা। ভয় নাই, ভয় নাই, দিলাম আশ্বাস।
রজনী হইল, রামা, যাহ নিজবাস॥

প্রভাকর—(১) সূর্য্য ; (২) "সংবাদ-প্রভাকর"-সম্পাদক কবি-ভাস্কর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বর—পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (বঙ্গাব্দ ১২২৭-১২৯৮)।

অক্ষয়কুমার—চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত (বঙ্গাব্দ ১২২৭-১২৯৩)।

আমার তনয়গণে দিয়া উপদেশ।
ত্বরায় করিব তব এ দুঃখের শেষ॥
কিন্তু মম উপদেশ তোমার কুমার।
শুনে কি না শুনে মনে সন্দেহ আমার॥
তোমার যদ্যপি কিছু থাকে কহিবারে।
বলহ আমায় আমি কহিব সবারে॥

বঙ্গভাষা। এ জগতে সতি, তুমি গুণবতী,
তোমারে শিখাব কিবা।
তবে গো, সুন্দরি, যদি কৃপা করি,
আমারে প্রসাদ দিবা॥
তোমার সহিতে, সাক্ষাৎ করিতে,
আইলে যুবক সবে।
মোর দিব্য লাগে, সকলের আগে,
এই ক'টি কথা কবে॥—
স্বদেশীয় ভাষ, শিখিতে উল্লাস,
না হয় অন্তরে যার।
বিধাতার ভুলে, মানবের কুলে,
জনম হয়েছে তার॥

আমার তনয়গণে—অর্থাৎ ভারতবর্ষের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত ইংরাজদিগকে। ইংরাজেরা বাঙ্গালা ভাষা চর্চ্চায় অনেক সহায়তা করিয়াছেন। আগে—অগ্রে, সম্মুখে।

নবীন-যুগ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

[১২৩০-১২৮০]

যশোহর জেলার অন্তর্গত সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুস্থদন দত্তের জন্ম। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অসাধারণ বিদ্যানুরাগ ছিল, এবং তাঁহার আশাও খুব উচ্চ ছিল। কিন্তু তিনি কখনও সংযম অভ্যাস করিতে পারেন নাই।

কলিকাতার তদানীন্তন হিন্দু কলেজে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি পরবর্ত্তী কালের কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তি কলেজে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। মধুস্থদন কলেজের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন।

ইংরাজী শিক্ষার মদিরাপানে উন্মত্ত হইয়া তখনকার হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা আচার-ব্যবহারে ও চিন্তায় একেবারে সাহেব হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধুস্থদনে এই ভাব চরমে উঠিয়াছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্যের চর্চ্চায় তন্ময় হইয়া উঠিলেন; বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা আদৌ করিতেন না। সেই অল্প বয়সেই সুন্দর সুন্দর ইংরাজী কবিতা রচনা করিয়া তিনি সকলকে চমৎকৃত করিতেন; এবং কালে ইংরাজী ভাষার একজন উৎকৃষ্ট কবি

হইবার উচ্চ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতেন। কলেজে পড়িতে পড়িতেই উনবিংশতি বৎসর বয়সে মধুসূদন খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম মাইকেল মধুসূদন হয়।

কলেজ ত্যাগ করিয়া মধুসূদন মান্দ্রাজে খ্রীষ্টানদিগের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিযুক্ত হন। শিক্ষকতা করিতে করিতে তিনি এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহ সুখের হয় নাই। কিছুকাল পরে এই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইল। মধুসূদন আর এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেন। এই রমণী প্রকৃত হিন্দু স্ত্রীর ন্যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মধুসূদনের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন।

মান্দ্রাজ-প্রবাস-কালে মধুসূদন কয়েকখানি ইংরাজী কাব্য প্রণয়ন করেন। ইহার একখানি তিনি বাঙ্গালাদেশের তদানীন্তন ব্যবস্থা-সচিব ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন সাহেবকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। বেথুন সাহেব মধুসূদনকে তাঁহার কবি-প্রতিভা বঙ্গ-ভাষার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিবার উপদেশ দেন। এই উপদেশে মধুসূদনের ভ্রম ঘুচিল। তিনি বিস্মৃতপ্রায় মাতৃভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন। কলিকাতা হইতে বাল্য-পরিচিত কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।

প্রায় আট বৎসর কাল মান্দ্রাজে থাকিয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সেই সময় কলিকাতার কয়েকজন ধনী ব্যক্তি বেলগাছিয়াতে ইংরাজী নাট্যশালার অনুকরণে একটি

নাট্যশালা স্থাপন করেন। কিন্তু অভিনয়ের উপযোগী কোন নাটক তখনও বঙ্গভাষায় রচিত হয় নাই।

মধুসূদন "শর্ম্মিষ্ঠা" নামে এক নাটক লিখিলেন। সাহেব মধুসূদনের বাঙ্গালা নাটক দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও চমৎকৃত হইল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শর্ম্মিষ্ঠা প্রকাশিত হয়।

"শর্ম্মিষ্ঠা" রচনার পর হইতে মধুসূদনের হাত খুলিয়া গেল। তিনি বাঙ্গালা-কাব্যরচনায় হস্তক্ষেপ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা হইল অমিত্রচ্ছন্দে কাব্য লিখিবেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দে কোন কাব্য রচিত হয় নাই। তখন বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের একাধিপত্য। অমিত্রচ্ছন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে চলিতে পারে, কেহই এ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন অমিত্রচ্ছন্দে "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্য প্রণয়ন করিলেন। "তিলোত্তমা-সম্ভব" পাঠ করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায় চমৎকৃত হইলেন। বাঙ্গালা ভাষার যে এত শক্তি আছে, তাহা ইহার পূর্ব্বে কেহই অনুভব করেন নাই। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিলোত্তমা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ইহার পর মধুসূদন উপর্য্যুপরি কয়েকখানি নাটক ও প্রহসন রচনা করেন।

পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে "মেঘনাদ-বধ" কাব্য প্রকাশিত হয়। "মেঘনাদ-বধে" মধুসূদনের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ। মধুসূদনের যশঃ-সৌরভে বঙ্গদেশ পরিব্যাপ্ত হইল।

ইহার পর মধুসূদন ব্রজাঙ্গনা কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণ-কুমারী নাটক প্রণয়ন করেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন ব্যারিষ্টার হইবার অভিপ্রায়ে বিলাত যাত্রা করেন। ইউরোপ-প্রবাস-কালে তাঁহার "চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" রচিত হয়।

নিজের অসংযম ও অমিতব্যয়িতার ফলে মধুসূদন ইউরোপ-প্রবাস-কালে অর্থাভাবে যার-পর-নাই কষ্ট পান। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে কয়েকবার রক্ষা করেন।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার কিছু পসারও হইয়াছিল; কিন্তু হাতে টাকা আসিলে তিনি অসংযতভাবে খরচ করিতেন। দানেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। ইহার ফলে তাঁহার অভাব কখনও ঘুচে নাই। তাঁহার শেষ জীবনের বিষাদময় কাহিনী পাঠ করিলে হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে। দুরারোগ্য রোগে ও দারুণ দৈন্যে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষয় পাইতে লাগিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আলিপুরের দাতব্য চিকিৎসালয়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

মধুসূদন হইতে আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের আরম্ভ। এই সাহিত্যের উপর য়ুরোপীয় সাহিত্য, বিশেষতঃ ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। ইংরাজী-শিক্ষিত ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে ইহার সম্পূর্ণ ভাবগ্রহ অসম্ভব।

বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য এখন আর পল্লীর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে; ইহা বিশ্ব-সাহিত্যের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।

দিন দিন জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হইতেছে। জগতে ভাব-

রাজ্যে নিত্য নূতন নূতন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে ; বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য এই পরিবর্ত্তনের সহিত স্বর মিলাইয়া অগ্রসর হইতেছে।

জীবন-সংগ্রাম দিন দিন প্রবল আকার ধারণ করিতেছে। চতুর্দ্দিকে অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য, যেন কাহারও হাঁফ ছাড়িবার সময় নাই। সকলেই জীবন-সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে। যে জাতি এই সংগ্রামে পশ্চাৎপদ হইতেছে, সে-ই পিষ্টপেষিত হইতেছে। কাজেই আধুনিক বাঙ্গালা-কাব্য-সাহিত্যে প্রাচীন কবিদিগের শান্তি ও নিশ্চিন্ততা নাই ; তাঁহাদিগের প্রাণভরা হাসি-কৌতুক নাই।

প্রাচীন কবিদিগের দৃষ্টি ছিল পরকালের দিকে। আধুনিক কবি ইহকালে সাফল্য কামনা করেন। প্রাচীন কবি এ জীবনে বিফল হইয়া, পরকালের আশায় শান্তিলাভ করিতেন। পরকালে অবিশ্বাসী বা সন্দিগ্ধ আধুনিক কবি ইহ জীবনের বিফলতায় একেবারে মুহ্যমান হইয়া পড়েন।

আদর্শেরও বিভিন্নতা ঘটিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি তদানীন্তন সমাজের বাঙ্গালী নরনারীদিগের চরিত্রই চিত্রিত করিয়াছেন। আধুনিক কবির লক্ষ্য—আদর্শ-চরিত্র-সৃষ্টি। এই আদর্শ অনেক সময়েই য়ুরোপীয় আদর্শ। পৌরাণিক দেব-দেবীগণের চরিত্রও এই আদর্শে গঠিত হইতেছে।

প্রাচীন বাঙ্গালী কবি, তাঁহার কাব্যে নিজের কথা বড় বলিতেন না। আরাধ্য দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনই তাঁহার

উদ্দেশ্য; তাই তিনি নিজেকে কাব্য হইতে সরাইয়া রাখিতেন। আধুনিক বাঙ্গালা কাব্যে কবি অনেক সময় নিজের কথাই ব্যক্ত করেন। ইহা হইতেই আধুনিক বাঙ্গালা গীতি-কাব্যের সৃষ্টি।

প্রাচীন বাঙ্গালী কবির লক্ষ্য পরকালের দিকে ছিল বলিয়া, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁহার বিশেষ কোন মমত্ববুদ্ধি ছিল না। ইহকাল-তুষ্ট আধুনিক কবির নিকট জন্মভূমি দেবীর ন্যায় পূজনীয়া, মাতৃভাষা পরম সাধনার সামগ্রী। এই জন্মভূমির ধারণা ক্রমশঃ স্বগ্রাম ও বঙ্গদেশ ছাড়াইয়া সমগ্র-ভারতব্যাপী হইয়াছে।

আধুনিক বাঙ্গালী কবির ভাষা মার্জ্জিত; রুচি বিশুদ্ধ। বিষয়ে ও ভাবে তিনি ইংরাজী-শিক্ষিত পাঠকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাব্য রচনা করেন। এই জন্য আধুনিক বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

মোটামুটি এই কয়টি কথা মনে রাখিলেই, আধুনিক বাঙ্গালা কবিতা বুঝিবার পক্ষে সহায়তা হইবে। পরবর্ত্তী কবিগণের সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কথা বলিব না।

আত্ম-বিলাপ

[১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত।]

আশার ছলনে ভুলি, কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে!
জীবন-প্রবাহ বহি' কাল-সিন্ধু পানে যায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না, একি দায়!

রে প্রমত্ত মন মম, কবে পোহাইবে রাতি?
জাগিবি রে কবে?
জীবন-উদ্যানে তোর যৌবন-কুসুম-ভাতি
কত দিন রবে?
নীর-বিন্দু দূর্ব্বাদলে, নিত্য কিরে ঝলমলে?
কে না জানে অম্বুবিম্ব অম্বুমুখে সদ্যপাতি?

যৌবন-কুসুম-ভাতি—যৌবনরূপ পুষ্পের শোভা। অম্বুবিম্ব—জলবিম্ব। অম্বুমুখে সদ্যপাতি—বৃষ্টি হইবার মুখে সরোবরাদিতে যে সমস্ত জলবিম্বের সৃষ্টি হয়, তাহারা হইয়াই তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

নিশার স্বপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে !
ক্ষণপ্রভা প্রভা-দানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে !
মরীচিকা মরুদেশে নাশে প্রাণ তৃষা-ক্লেশে,
এ-তিনের ছল সম ছল রে এ কু-আশার !

বাকি কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে,
সে সাধ সাধিতে ?
ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল-কণ্টকগণে,
কমল তুলিতে !
নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী !
এ বিষম বিষ-জ্বালা ভুলিবি, মন, কেমনে ?

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়,
কব তা কাহারে ?
সুগন্ধ কুসুমগন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়
কাটিতে তাহারে ;—
মাৎসর্য্য বিষদশন কামড়ে রে অনুক্ষণ !
এই কি লভিলি লাভ অনাহারে, অনিদ্রায় ?

ক্ষণ-প্রভা—বিদ্যুৎ। মরীচিকা—সূর্য্যকিরণে জলভ্রান্তি। এ তিনের—স্বপ্ন, ক্ষণপ্রভা, মরীচিকা। ব্যয়িলি—ব্যয় করিলি। মাৎসর্য্য—পরশ্রীকাতরতা।

মুকুতাফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে
যতনে ধীবর ;
শত-মুক্তাধিক আয়ু কাল-সিন্ধু-জলতলে
ফেলিস্ পামর !
ফিরে দিবে হারাধন, কে তোরে অবোধ মন ?
হায় রে, ভুলিবি কত আশার কুহকছলে !

বঙ্গভূমির প্রতি

[মধুস্থদন, বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে, নিম্নলিখিত কবিতায় বঙ্গভূমির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন।]

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করোনা গো তব মনঃ-কোকনদে ॥
প্রবাসে দৈবের বশে,
জীবতারা যদি খসে,
এ দেহ-আকাশ হ'তে নাহি খেদ তাহে।
জন্মিলে মরিতে হবে,
অমর কে কোথা কবে ?
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে জীবন-নদে ?

কাল-সিন্ধুজল-তলে—কালরূপ সমুদ্রের তলে। পরমাদ—প্রমাদ, বিপদ। জীবতারা—জীবনরূপ তারা।

কিন্তু যদি রাখ মনে,
নাহি, মা, ডরি শমনে,
মক্ষিকাও গলে না গো, পড়িলে অমৃত-হ্রদে।
সেই ধন্য নরকুলে,
লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।
কিন্তু কোন্ গুণ আছে,
যাচিব যে তব কাছে,
হেন অমরতা আমি, কহ গো শ্যামা জন্মদে!
তবে যদি দয়া কর,
ভুল দোষ, গুণ ধর,
অমর করিয়া বর দেহ দাসে, সু-বরদে!
ফুটি যেন স্মৃতিজলে,
মানসে, মা, যথা ফলে,
মধুময় তামরস, কি বসন্ত, কি শরদে॥

মক্ষিকাও গলে না ইত্যাদি—মক্ষিকা যেমন মধুর মধ্যে পড়িলেও মরে না, সেইরূপ তোমার স্নেহরূপ অমৃতরাশির মধ্যে মক্ষিকার ন্যায় ক্ষুদ্র আমিও যদি স্থান লাভ করি, তাহা হইলেও নষ্ট হইব না। শ্যামা জন্মদে—হে জন্মদাত্রী শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমি। সু-বরদে—হে উৎকৃষ্ট-বরদায়িনি জন্মভূমি। স্মৃতিজলে—স্মৃতিরূপ সরোবরে। মানসে—মানস-সরোবরে। তামরস—পদ্ম। শরদে—মিলের অনুরোধে এইরূপ লেখা হইয়াছে।

বঙ্গভাষা

["চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী" হইতে গৃহীত। কবি প্রথম বয়সে বঙ্গভাষাকে অনাদর করিয়াছিলেন বলিয়া আক্ষেপ।]

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;—
তা' সবে—অবোধ আমি !—অবহেলা করি'
পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি'।
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি' কায়মন,
মজিনু বিফল তপে অ-বরেণ্যে বরি' ;
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিলা পরে,—
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি ;—
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

অ-বরেণ্যে—যাহা বরেণ্য অর্থাৎ প্রার্থনীয় নহে তাহাকে। শৈবলে—শেয়ালায়। মাতৃকোষে—জননীর ভাণ্ডারে।

সীতার পঞ্চবটী বর্ণন

[রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়া, লঙ্কায় অশোকবনে রাখিয়াছিল। দুষ্ট চেড়ীরা তাঁহাকে সর্ব্বদা পাহারা দিত। সেই রাক্ষস-পুরীতে একমাত্র বিভীষণ-পত্নী সরমাই তাঁহার হিতৈষিণী ছিলেন। সীতা যখন নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইতেন, তখন সরমা আসিয়া তাঁহার দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। একদিন, সরমার অনুরোধে, সীতা তাঁহাদের বনবাসের প্রথম অবস্থার কথা এইরূপে বর্ণনা করেন। "মেঘনাদ-বধের" চতুর্থ সর্গ হইতে এই অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।]

ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চূড়ে
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে। ছিনু ঘোর বনে,
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্তে সুর-বন সম।
সদা করিতেন সেবা লক্ষ্মণ সুমতি।
দণ্ডক ভাণ্ডার যার, ভাবি দেখ মনে,
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি'
নিত্য ফলমূল বীর সৌমিত্রি; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে

সুরবন—নন্দনকানন। দণ্ডক—দণ্ডকারণ্য।

সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী ;
দয়ার সাগর নাথ বিদিত জগতে।

ভুলিনু পূর্ব্বের সুখ ; রাজার নন্দিনী,
রঘুকুল-বধূ আমি ; কিন্তু এ কাননে,
পাইনু, সরমা সই, পরম পীরিতি।
কুটীরের চারিদিকে কত যে ফুটিত
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে ?
পঞ্চবটী-বন-চর মধু নিরবধি।
জাগাত প্রভাতে মোরে, কুহরি' সুস্বরে
পিক-রাজ ! কোন্ রাণী, কহ শশিমুখি,
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে
খোলে আঁখি ? শিখীসহ শিখিনী সুখিনী
নাচিত দুয়ারে মোর ; নর্ত্তক নর্ত্তকী
এ দোঁহার সম, রামা, আছে কি জগতে ?
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী,
মৃগশিশু, বিহঙ্গম,—স্বর্ণ-অঙ্গ কেহ,
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত,

পীরিতি—প্রীতি, আনন্দ। মধু—বসন্তকাল ; পঞ্চবটীবনে চির-বসন্ত বিরাজ করিত। চিত্ত-বিনোদন—হৃদয়ের আনন্দজনক। বৈতালিক—স্তুতিপাঠক ; যাহারা প্রাতঃকালে স্তুতিপাঠ করিয়া রাজাদিগকে জাগাইত। করভ—হস্তিশাবক।

যথা বাসবের ধনু ঘন-বর-শিরে।
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে।
অজিন (রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে !)
পাতি' বসিতাম কভু দীর্ঘ-তরু মূলে ;
গাহিতাম গীত শুনি' কোকিলের ধ্বনি।
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদী-তটে ; দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন, নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত-কান্তি ! কভু বা উঠিয়া
পর্ব্বত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি,
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি
বিশাল রসাল-মূলে ; কত যে আদরে
তুষিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন-
সুধা, হায়, কব কারে ? কব বা কেমনে ?

বাসবের ধনু—ইন্দ্রধনু ; রামধনু। ঘন-বর—বৃহৎ মেঘ। অজিন—মৃগচর্ম্ম ; ব্রততী—লতা। রসাল—আম্রবৃক্ষ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

[১২৪৫-১৩১০]

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিলেও, ইনি ব্যয়ে মুক্তহস্ত ছিলেন। এইজন্য কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। ইহার ফলে শেষ দশায় ইঁহাকে অর্থাভাবে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। তাহার উপর দৃষ্টিশক্তির নাশ হওয়ায় ইঁহার অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছিল। চিন্তা-তরঙ্গিণী, ভারত-বিলাপ, ভারত-ভিক্ষা, বৃত্রসংহার, আশা-কানন, ছায়াময়ী, দশ মহাবিদ্যা প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য ও কবিতা ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। অন্ধ অবস্থায় "চিত্ত-বিকাশ" নাম দিয়া কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত করেন।

ইঁহার স্বদেশ-প্রেমের কবিতাগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর সমস্ত দেশ অদম্য উৎসাহে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আর ভারত শুধুই ঘুমাইয়া রহিয়াছে, এই দুঃখের কথাই তিনি জ্বালাময়ী ভাষায় গাহিয়া গিয়াছেন।

চিন্তাকুল যুবা

["চিন্তা-তরঙ্গিণী" হইতে উদ্ধৃত ।]

শীতল বাতাস বয় জলের কল্লোল ।
রাঙা রবি-ছবি ল'য়ে খেলায় হিল্লোল ॥
ধীরে ধীরে পাতা কাঁপে, পাখী করে গান ।
লোহিত-বরণ ভানু অস্তাচলে যান ॥
বিচিত্র গগনময় কিরণের ঘটা ।
হরিদ্রা, পাটল, নীল, লোহিতের ছটা ॥
হেরিয়া ভবের শোভা জুড়ায় নয়ন ।
শীতল শরীর, সেবি' মলয় পবন ॥
হেন সন্ধ্যাকালে যুবা পুরুষ নবীন ।
ভ্রমে নদীর কূলে একা একদিন ॥
দেখিলে মানুষ বলি' মনে নাহি লয় ।
সুরপুরবাসী বলি' মনে ভ্রম হয় ॥
শাপেতে পড়িয়া যেন ধরার ভিতরে ।
পূর্ব্বকথা আলোচনা করিছে কাতরে ॥

কল্লোল, হিল্লোল—ঢেউ ।

একদৃষ্টে এক দিকে রহি কতক্ষণ।
কহিতে লাগিল যুবা প্রকাশি' তখন ॥—
দেবের অসাধ্য রোগ চিন্তার বিকার।
প্রতীকার নাহি তার বুঝিলাম সার ॥
নহিলে এখনো কেন অন্তর আমার।
ব্যথিত হ'তেছে এত দহনে তাহার ॥
চারিদিকে এই সব জগতের শোভা।
কিছুই আমার কাছে নহে মনোলোভা ॥
এই যে অলক্তময় ভানুর মণ্ডল।
এই সব মেঘ যেন জ্বলন্ত অনল ॥
এই যে মেঘের মাঝে দিবাকর-ছটা।
সোনার পাতায় যেন সিন্দুরের ঘটা ॥
এই শ্যাম দূর্ব্বাদল, এই নদী-জল।
মণ্ডিত লোহিত-রবি-কিরণে সকল ॥
নিরানন্দ রসহীন সকলি দেখায়।
নয়নের কাছে সব ভাসিয়া বেড়ায় ॥
মনের আনন্দে ঐ পাখী করে গান।
জানায় জগত-জনে রবি অস্ত যান ॥
উর্দ্ধপুচ্ছ গাভী অই পাইয়া গোধূলি।
যাইতেছে ঘরমুখে উড়াইয়া ধূলি ॥
কৃষক, রাখাল, আর গৃহী যতজন।
সেবিয়া শীতল বায়ু পুলকিত-মন ॥

পৃথিবীর যত জীব প্রফুল্ল সকল।
অভাগা মানব আমি অসুখী কেবল॥
ত্যজি' গৃহ-কারাগার এনু নদী-তটে।
দেখিতে ভবের শোভা আকাশের পটে॥
ভাবিনু শীতল বায়ু পরশিলে গায়।
চিন্তার বিষের জ্বালা নিবারিবে তায়॥
চিন্তা-বিষে মন যার জ্বরে একবার।
নিরুপায় সেইজন বুঝিলাম সার॥

জীবন-সঙ্গীত

[আমেরিকার কবি Longfellow প্রণীত Psalm of Life নামক ইংরাজী কবিতার ভাবানুবাদ।]

বলো না কাতর স্বরে,— বৃথা জন্ম এ সংসারে,
এ জীবন নিশার স্বপন!
দারা পুত্র পরিবার, তুমি কার, কে তোমার,
ব'লে, জীব, করো না ক্রন্দন॥
মানব-জনম সার, এমন পাবে না আর,
বাহ্যদৃশ্যে ভুলো না রে মন!

কর যত্ন হবে জয়, জীবাত্মা অনিত্য নয়,
অহে জীব কর আকিঞ্চন ॥
করো না সুখের আশ, পরো না দুঃখের ফাঁস,
জীবনের উদ্দেশ্য তা' নয়।
সংসারে সংসারী সাজ, কর নিত্য নিজ কাজ,
ভবের উন্নতি যাতে হয় ॥
দিন যায় ক্ষণ যায়, সময় কাহারো নয়,
বেগে ধায় নাহি রহে স্থির।
সহায় সম্পদ্ বল, সকলি ঘুচায় কাল,
আয়ু যেন শৈবালের নীর ॥
সংসার-সমরাঙ্গনে, যুদ্ধ কর দৃঢ়পণে,
ভয়ে ভীত হয়োনা মানব।
কর যুদ্ধ বীর্য্যবান্, যায় যাবে যাক্ প্রাণ,
মহিমাই জগতে দুর্লভ ॥

জীবাত্মা অনিত্য নয়—দেহের বিনাশ হইলেও, আত্মা নিত্য, তাহার বিনাশ নাই; অতএব—'মানুষকে যখন মরিতেই হইবে, তখন বৃথা চেষ্টা করিয়া লাভ কি?' এই বলিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও না। করো না সুখের আশ ইত্যাদি—নিজের সুখ দুঃখ গ্রাহ্য না করিয়া, জগতের উন্নতির জন্য আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাও। শৈবালের নীর—শেয়ালার উপর যে জল থাকে তাহা যে কখন গড়াইয়া পড়িয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই; সেইরূপ জীবনও কখন যে শেষ হইবে তাহার স্থিরতা নাই।

মনোহর মূর্ত্তি হেরে, ওহে জীব, অন্ধকারে
ভবিষ্যতে কোরোনা নির্ভর।
অতীত সুখের দিনে, পুনঃ আর ডেকে এনে,
চিন্তা ক'রে হ'ওনা কাতর ॥
সাধিতে আপন ব্রত স্বীয় কার্য্যে হও রত,
একমনে ডাক ভগবান্।
সঙ্কল্প-সাধন হবে, ধরাতলে কীর্ত্তি রবে,
সময়ের সার বর্ত্তমান ॥
মহাজ্ঞানী, মহাজন, যে পথে ক'রে গমন,
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়।
সেই পথ লক্ষ্য ক'রে, স্বীয় কীর্ত্তিধ্বজা ধ'রে,
আমরাও হব বরণীয় ॥
সময়-সাগর-তীরে, পদাঙ্ক অঙ্কিত ক'রে,
আমরাও হব হে অমর।

মনোহর মূর্ত্তি হেরে ইত্যাদি—ভবিষ্যতে সুখের মোহিনী মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিও না। কারণ ভবিষ্যতের অন্ধকার-গর্ভে কি নিহিত আছে তাহা কেহই বলিতে পারে না। অতীত সুখের দিনে ইত্যাদি—যে সমস্ত সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের বিষয় চিন্তা করিয়াও বৃথা দুঃখিত হইও না; অতীত ও ভবিষ্যৎ পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানকে সফল করিবার চেষ্টা কর। সময়-সাগর-তীরে ইত্যাদি—কালরূপ সাগরের তীরে আমরা যে পদ-চিহ্ন রাখিয়া যাইব, অর্থাৎ আমাদের কর্ম্মময় জীবনের যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইব, তাহা আমাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া অপরেও যশোলাভ করিবে।

সেই চিহ্ন লক্ষ্য ক'রে, অন্য কোন জন পরে,
যশোদ্বারে আসিবে সত্বর ॥

করোনা মানবগণ, বৃথা ক্ষয় এ জীবন,
সংসার-সমরাঙ্গন-মাঝে।
সঙ্কল্প ক'রেছ যাহা, সাধন করহ তাহা,
রত হ'য়ে নিজ নিজ কাজে ॥

কাল-চক্র

বারেক এখনও কিরে দেখিবি না চাহিয়া ?-
উন্নত গগন 'পরে,
ব্রহ্মাণ্ড উজ্জ্বল ক'রে,
উঠেছে নক্ষত্র কত নব জ্যোতি ধরিয়া !

হেরে সে নক্ষত্র-ভাতি,
দেখরে মানব-জাতি
ছুটেছে তাদের সনে,
আনন্দ-উৎসাহ মনে,
নিজ-নিজ উন্নতির জয়পত্র বাঁধিয়া।

চলেছে বুধ-মণ্ডলী,
নরে করি' কুতূহলী,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,
ছিঁড়িয়া আনিছে তারা
শূন্য হ'তে ধরাতলে জ্ঞান ডোরে বাঁধিয়া।

আকাশ-পাতাল-গত
পঞ্চভূত আদি যত,
প্রকৃতি ভয়েতে দ্রুত দেখাইছে খুলিয়া।
সরস্বতী কুতূহলা,
সাহিত্য দর্শন কলা,
স্বহস্তে সহস্র মালা দিতেছেন তুলিয়া ;
কমলা অজস্র ধারে,
ভাঙ্গিয়া নিজ ভাণ্ডারে,
ধন রাশি স্তূপাকারে দিতেছেন ঢালিয়া।

কবিকুল কোলাহলে,
মুখে জয়ধ্বনি ব'লে,
উন্নতি-তরঙ্গ সঙ্গে
ছুটিছে অশেষ রঙ্গে,
স্বজাতি-সাহস-কীর্ত্তি উচ্চৈঃস্বরে গাহিয়া।

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ইত্যাদি—এখানে বিজ্ঞানের উন্নতির কথা বলা হইয়াছে। বিজ্ঞানের বলে মানুষ সৌর জগৎকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছে এবং প্রকৃতি

অই দেখ অগ্রে তার,
পরিয়া মহিমা-হার,
চলেছে ফরাসীজাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

চলেছে রে দেখ চেয়ে,
শত বাহু প্রসারিয়ে,
অর্দ্ধ সসাগরা ধরা অলঙ্কারে ভূষিয়া,
আমেরিকাবাসিগণ,
নদ গিরি প্রস্রবণ,
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।

বিস্তারিয়া তেজোরাশি,
দেখ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরু দ্বীপ সসাগরা,
যতদূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।
তবুও বারেক কিরে দেখিবি না চাহিয়া?

ছিল সাধ বড় মনে,
ভারতও ওদেরি সনে,
চলিবে উজলি' মহী করে কর বাঁধিয়া;

তাহার যে সমস্ত রহস্য এতদিন লুকাইয়া রাখিয়াছিল, এখন ভয়ে তাহা উদঘাটিত করিয়া দেখাইতেছে।

আবার উজ্জ্বল হ'বে,
নব প্রজ্বলিত ভাবে,
ভারত উন্নতি-স্রোতে চলিবে রে ভাসিয়া।
সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর,
একজন (ও) কাঁদে নারে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া!

দধীচির আত্ম-ত্যাগ

["বৃত্রসংহার" কাব্যের ত্রয়োদশ সর্গ হইতে গৃহীত। শিবের বরে দৃপ্ত বৃত্রাসুর দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গের সিংহাসন অধিকার করে ও দেবতাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যচার করিতে থাকে। শিব তাহাতে ক্রুদ্ধ হন ও ইন্দ্রকে, দধীচি মুনির পবিত্র অস্থি আনয়ন করিয়া তাহাতে বজ্র নির্ম্মাণ করাইয়া, তদ্দ্বারা বৃত্রের প্রাণসংহার করিতে উপদেশ দেন। ইন্দ্র দধীচির অস্থি প্রার্থনা করিবার জন্য মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন।]

উঠি' তপোধন,
সশিষ্য, সম্ভ্রমে সুখে অতিথি সম্ভাষি,
যোগাইলা মৃগচর্ম্ম—পবিত্র আসন।
জিজ্ঞাসিলা সুশীতল গম্ভীর বচনে,—
"আশ্রমে কি হেতু গতি, কিবা অভিলাষ?"

কে পারে আনিতে মুখে সে নিষ্ঠুর বাণী,
কে পারে কহিতে অন্যে প্রাণ-ভিক্ষা-দান,
না পেয়ে হৃদয়ে ব্যথা? কে হেন দারুণ
প্রাণিমাঝে? নিস্পন্দ, নিস্তব্ধ পুরন্দর।
হেরি ঋষি ক্ষণকাল, ধ্যানেতে জানিলা
অতিথির অভিলাষ; গদ-গদ-স্বরে
মহানন্দে তপোধন কহিলা তখন,—
"পুরন্দর, শচীকান্ত, কি সৌভাগ্য মম,
জীবন সার্থক আজি, পবিত্র আশ্রম।
এ জীর্ণ-পঞ্জর-অস্থি পঞ্চভূতে ছার
না হ'য়ে অমরোদ্ধারে নিয়োজিত আজি!
হা দেব! এ ভাগ্য মম স্বপ্নের অতীত!"
এতেক কহিয়া ধীরে, মহাতপোধন
আইলা অঙ্গন-মাঝে; কৈলা অধিষ্ঠান
সুনিবিড়, সুশীতল, পল্লব-শোভিত
শতবাহু-বট-মূলে। আনি যোগাইল
সাশ্রুনেত্রে শিষ্যবৃন্দ আকুল-হৃদয়
যোগাসন, গাঙ্গেয় সলিল সুবাসিত।
মুনীন্দ্রে তাপসবৃন্দ মাল্যে সাজাইলা।
চাহি শিষ্যকুল-মুখ, মধুর সম্ভাষে

অমরোদ্ধারে—দেবতাদিগের উদ্ধার কার্য্যে। গাঙ্গেয় সলিল—গঙ্গাজল।

কহিলেন, অশ্রুধারা মুছায়ে সবার,
সুধাপূর্ণ বাণী ধীরে ধীরে ;—"কি কারণ,
হে বৎসমণ্ডলী, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভবমণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কয়জন ?
হায় রে অবোধ প্রাণি ! এ নশ্বর দেহ
না ত্যজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিব ?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে ?
হে ক্ষুব্ধ তাপসবৃন্দ, হে শিষ্যমণ্ডলী,
জগৎ-কল্যাণ হেতু নরের সৃজন,
নরের কল্যাণ নিত্য সে ধর্ম্মপালনে।"
আরম্ভিলা তারস্বরে চতুর্ব্বেদ গান,
উচ্চে হরিসঙ্কীর্ত্তন মধুর গম্ভীর,
বাষ্পাকুল শিষ্যবৃন্দ ; ধ্যানে মগ্ন ঋষি
মুদিলা নয়ন-দ্বয় বিপুল উল্লাসে।
দেখিতে দেখিতে নেত্র হইল নিশ্চল,
নাসিকা নিশ্বাসশূন্য, নিস্পন্দ ধমনী ;
দধীচি ত্যজিলা তনু দেবের মঙ্গলে।

জন্মভূমি

["চিত্ত-বিকাশ" হইতে উদ্ধৃত।]

এই ত আমার জগতের সার
  স্মৃতি-সুখকর জনম-ঠাঁই ;
যেখানে আহ্লাদে নবীন আস্বাদে
  শৈশব-জীবন সুখে কাটাই।
সে সুখের দিন আজও পড়ে মনে,
ভুলিব না যাহা কভু এ-জীবনে,
    যেখানেই থাকি যেথায় যাই।

হেরিয়াছি কত নগরী নগর,
কত রাজধানী অপূর্ব্ব, সুন্দর,
    এ শোভা ঐশ্বর্য্য কোথাও নাই॥

গৃহ ঘাট মাঠ তরু জলাশয়,
স্মৃতি-পরিমল-মাখা সমুদয়,
    হেন স্থান আর কোথায় আছে?

জগতে জননী, জনম ভুবন,
গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন,
    স্বরগও নিকৃষ্ট দু'য়েরই কাছে।

স্মৃতি-পরিমল-মাখা—স্মৃতির সুগন্ধ মাখা; অর্থাৎ ইহাদিগকে দেখিলে মনে অতীতের সুখ-স্মৃতি জাগিয়া উঠে।

আগেকার মত যেন হেরি সব,
আগেকারই মত পশু-পক্ষি-রব,
আগেকারই মত করি শ্রবণ।

জুড়াতে পরাণ ইহার সমান,
নাহি কিছু আর, নাহি কোন স্থান,
চিরতৃপ্তিকর মধুর এমন॥

মহা মরুময় হয় যদি স্থান,
দারুণ উত্তাপে জ্বলে যায় প্রাণ,
তবুও সে দেশ, স্বদেশ যার,

তাহার নয়নে তেমন সুন্দর
মনোহর স্থান পৃথিবী সাগর,
নাহিক ভূতলে কোথাও আর।

কে আছে এমন মানব-সমাজে,
হৃদি-তন্ত্রী যার আনন্দে না বাজে,
বহুদিন পরে হেরি' স্বদেশ?

না বলে উল্লাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
প্রেম-ভক্তি-মোহ-অনুরাগ-ভরে,
এই জন্মভূমি আমার দেশ?

তুমি বঙ্গমাতা এত হীনপ্রাণা.
এত যে মলিনা, এত দীন-হীনা,
তোমারও সন্তান স্বদেশে ফিরে!

হেরে তব মুখ মনে ভাবে সুখ,
প্রাণের আবেগে হইয়া সোৎসুক,
নিজ জন্মদেশ আনন্দে হেরে ॥

হে জগৎপতি, দাসের মিনতি,—
রেখো এই দয়া বঙ্গমাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখনও কেহ,—

যেখানেই থাক্, যেখানেই যাক্,
যতই সম্মান যেখানেই পাক্,
না ভুলে স্বদেশ-ভকতি-স্নেহ ॥

নবীনচন্দ্র সেন

[১২৫৩-১৩১৬]

নবীনচন্দ্র সেন চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসী ছিলেন। ইনি কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনা করিতেন। ইঁহার অল্প বয়সের রচনা পাঠ করিয়া অনেকেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। "অবকাশ-রঞ্জিনী", "পলাশীর যুদ্ধ", "অমিতাভ", "অমৃতাভ", "রৈবতক", "কুরুক্ষেত্র", "প্রভাস" প্রভৃতি অনেক কাব্য ও কবিতা ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। "আমার জীবন" নাম দিয়া ইনি স্বয়ং আত্মচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। যথাক্রমে কৃষ্ণের আদি, মধ্য ও অন্ত্য জীবন অবলম্বনে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস কাব্য রচিত। সমগ্র ভারতে এক ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপনের জন্য কৃষ্ণের ঐকান্তিক চেষ্টা এই কাব্যত্রয়ে বর্ণিত আছে। নবীনচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র নূতন ছাঁচে গঠিত।

সিদ্ধার্থের দয়া

["অমিতাভ" কাব্যের তৃতীয় সর্গ হইতে গৃহীত। বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত অবলম্বনে এই কাব্য প্রণীত। বুদ্ধদেবের অপর নাম অমিতাভ ও সিদ্ধার্থ।]

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতেছিলা বসি' অন্যমন ;
শুক্ল মেঘখণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দ-লহরী-পূর্ণ করিয়া গগন
যাইছে ভাসিয়া সুখে ; হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার-অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শর, লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিলা প্রথম ;
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য প্রস্রবণ।
করুণার অশ্রুজলে, করুণার পরশনে,
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল ;
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধ জননীর মত,
চাহি ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।

কি মহিমা করুণার ! কাননের বিহঙ্গও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান !
উভয়ে উভয় পানে নীরবে চাহিয়া, কিবা
করুণায় উভয়ের বিমোহিত প্রাণ !
আসি দেবদত্ত কহে— "কুমার, এ হংস মম,
মম শরে হ'য়ে হত পড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিলা ধীরে— "হত্যাকারী হতজীব
পায় যদি, ভাই, কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বলে ;
যে দেয় জীবন তারে, সে কি তারে পাইবে না ?
হত নহে এই হংস, আহত কেবল ;
আঘাতের ব্যথা ভাই, আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হ'য়েছে বিকল।
তোমারও ত আছে প্রাণ, পাখীটির ক্ষুদ্রপ্রাণে
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?
লও তুমি শাক্য রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা ;
এ হংস আমার ; আমি দিব না কখন।"

নিমাই ও রঘুনাথ

["অমৃতাভ" হইতে উদ্ধৃত। চৈতন্য-চরিত-অবলম্বনে "অমৃতাভ" রচিত।]

নিমাই ও রঘুনাথ একদা উভয়ে
হ'তেছেন গঙ্গাপার। কহে রঘুনাথ—
"ভাই বিশ্বম্ভর! হাতে কি গ্রন্থ তোমার?"
"ন্যায়গ্রন্থ স্বরচিত"—শুনিয়া উত্তর,
হইলেন রঘুনাথ মলিন-বদন।
চাহিলে শুনিতে গ্রন্থ, লাগিলা পড়িতে
অনিচ্ছায় বিশ্বম্ভর। বিস্ময়ে নিমাই
দেখিলা, যতই গ্রন্থ করিছে শ্রবণ
ততই শ্রোতার মুখ হতেছে মলিন।
জিজ্ঞাসিলে হেতু তার, কহিলেন খেদে
রঘুনাথ—"বিশ্বম্ভর! বহু পরিশ্রমে
করিয়াছি প্রণয়ন এক গ্রন্থ আমি।
কিন্তু, ভাই, এই গ্রন্থ থাকিতে তোমার,
আমার 'দীধিতি' কেহ পড়িবে কি আর?

নিমাই—চৈতন্যদেব, ৩৪ পৃঃ দেখ। রঘুনাথ—রঘুনাথ শিরোমণি, চৈতন্যদেবের সমসাময়িক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক পণ্ডিত। রঘুনাথ, নব্য ন্যায়ের সৃষ্টিকর্ত্তা গঙ্গেশোপাধ্যায়-প্রণীত "চিন্তামণি" নামক দুরূহ গ্রন্থের "চিন্তামণি-দীধিতি" নামে টীকা প্রণয়ন করেন।

কে ছাড়ি' জ্যোৎস্না, চাহে আলো জোনাকির ?
চাহে কূপোদক ছাড়ি' বারি জাহ্নবীর ?"
সে মুহূর্ত্তে বিশ্বম্ভর গ্রন্থ আপনার
করিলেন বিসর্জ্জন গর্ভেতে গঙ্গার।
"কি করিলে ? কি করিলে ?"—কহি উচ্চৈঃস্বরে
চাহিলেন রঘুনাথ করিতে উদ্ধার।
হইয়া নিষ্ফল-যত্ন, স্তম্ভিত, বিস্মিত,
রহিলেন রঘুনাথ যেন চিত্রার্পিত,
চাহি বিশ্বম্ভর-পানে। হাসিয়া নিমাই
কহিলেন—"বৃথা খেদ কর তুমি ভাই !
ভক্তিহীন ন্যায়শাস্ত্র মরুর সমান,
ভক্তি-গঙ্গা-গর্ভে তার উপযুক্ত স্থান।"

ভারতের তপোবন

["রৈবতক" কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ হইতে গৃহীত। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে মহর্ষি ব্যাসের বদরিকাশ্রম দেখাইয়া, ভারতের তপোবন সকলের মহিমা বর্ণনা করিতেছেন।]

ভারতের পুণ্যাশ্রম—মহাতীর্থ সব ;
ঝড়পূর্ণ জগতের শান্তির নিবাস ;
সংসার-সমুদ্রে তীর ; আকাঙ্ক্ষা-লহরী—
অনন্ত অসংখ্য—নাহি প্রবেশে হেথায়।

নাহি ফলে হেথা কভু সুখ-দুঃখ-ফল
বিষয়-বাসনা-বৃক্ষে ; নাহি ফুটে ফুল
পাপের কণ্টকবৃন্তে চিত্তমুগ্ধকর।
নাহি হেথা সুখে দুঃখ ; শান্তিতে বিষাদ ;
প্রেমেতে স্বার্থের ছায়া ; দারিদ্র্যে দাহন।
ভারতের তপোবন—পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি ; কয়টি নক্ষত্র
আঁধার ভারতাকাশে ; জ্ঞানের আলোক
ঘোর মূর্খতা-আঁধারে। নীরব, নির্জ্জন
এই তপোবন হ'তে যখন যে জ্যোতিঃ,
পার্থ, হয় বিনির্গত, সমস্ত ভারত
ঝাঁপ দেয় তাহে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের মত।
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, নীতি সমাজের,
যে যে মহামন্ত্রবলে হ'তেছে চালিত
সমস্ত ভারতবর্ষ,—সকলি সকলি,

আকাঙ্ক্ষা-লহরী—নিত্য নূতন নূতন অভিলাষের তরঙ্গ। নাহি ফলে ইত্যাদি—তপস্বীদিগের বিষয়ভোগের অভিলাষ নাই ; সেইজন্য সেই অভিলাষ-জনিত সুখদুঃখ তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয় না। প্রতিকৃতি—প্রতিমূর্ত্তি। এই তপোবন হ'তে ইত্যাদি—তপোবন হইতে যখন যে জ্ঞানের আলোক বিকীর্ণ হয়, সমস্ত ভারত সেই আলোকের অনুসরণ করে ; অর্থাৎ ভারতবাসীরা তপঃ-শুদ্ধবুদ্ধি ঋষিদিগের দ্বারা পরিচালিত হয়।

নীরব নির্জ্জন এই আশ্রম-প্রসূত।
ভারত—সমাজদেহ ; আশ্রমনিচয়
তাহার হৃদয়যন্ত্র ; মস্তক তাহার
মহর্ষি ব্যাসের এই পবিত্র আশ্রম।

সেবাধর্ম্ম

[“কুরুক্ষেত্র” হইতে উদ্ধৃত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে অভিমন্যু-জননী সুভদ্রা শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিশেষে উভয় পক্ষের আহত সৈনিকদিগের সেবা করিতেন। তাঁহার সহচরী সুলোচনার সকল সময়ে ইহা ভাল লাগিত না। সুভদ্রা সুলোচনাকে সেবা-ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন। নবীনচন্দ্র সুভদ্রার এই চরিত্র Florence Nightingale প্রভৃতি মহামনা য়ুরোপীয় শুশ্রূষা-কারিণীদিগের আদর্শে অঙ্কিত করিয়াছেন।]

সুলোচনা। অভাগি ! এরূপে কিগো, অনিদ্রায় অনাহারে,
খোয়াইবে দেহ আপনার ?
নাহি রাত্রি, নাহি দিন, থাক প্রলেপের মত
লাগি’ অঙ্গে আহত সবার !
শিবিরে শিবিরে ঘুরি’ আহতের শুশ্রূষায়
হইয়াছে কি দশা তোমার !—

বসিয়া গিয়াছে চোক, মলিন বিবর্ণ মুখ,
ধূলায় ধূসর কেশভার।
আজি একাদশ দিন, বাধিল এ পোড়া রণ,
দেখি নাই তব হাসি-মুখ ;
এইরূপে রাত্রিদিন, মরিয়া মরার তরে,
নাহি জানি পাও কিবা সুখ !

সুভদ্রা। এর চেয়ে রমণীর কিবা আছে সুখ ?
রোগে শান্তি, দুঃখে দয়া, শোকেতে সান্ত্বনা-ছায়া,
দিদি, এই ধরাতলে রমণীর বুক।
যেমতি অনল, জল, সৃজিলেন নারায়ণ,
সৃজি' সেইরূপ, দিদি, রোগ শোক দুখ,
সৃজিলা অনন্ত-প্রেম-পূর্ণ নারী-বুক।
আছে আর কিবা সুখ, হায়, এইরূপে যদি,
ঢালিয়া অমৃত মৃতে, শান্তি যন্ত্রণায়;
রমণী-জীবন-গঙ্গা বহিয়া না যায় ?

সুলো। মানিনু নারীর ধর্ম্ম, আর্ত্ত-আহতের সেবা ;
কিন্তু শত্রুদের সেবা কেন ?
তাহাদের মড়া নিয়া, তাহারা মরুক গিয়া,
তোর কেন মাথাব্যথা হেন ?

সুভদ্রা। শত্রু !—শত্রু কি মানুষ নহে সে আমার মত
রক্ত মাংস নাহি কি তাহার ?

তোমার আমার প্রাণ, নহে কি শত্রুর প্রাণ ?
এক জল, ভিন্ন জলাধার।
তা'ও এক ধাতুময়, অস্ত্রে একরূপে হয়
সর্ব্বদেহ ক্ষত ও বিক্ষত ;
সহে একরূপ ব্যথা, একরূপ মৃত্যু-মুখে,
শত্রু মিত্র হয় নিপতিত।
শত্রু !—এক ভগবান্ সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয় ;
কেবা তুমি, কেবা আমি, কেবা শত্রু, মিত্র কেবা,
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয় ?

সুলো। তাই বলি' শত্রুকেও করিব কি মিত্রজ্ঞান ?
মিত্র অই কর্ণ দুর্য্যোধন ?
দুর্জ্জনেরও দুখে দুখী হইব কি সমভাবে ?
বিষামৃত করিব গ্রহণ ?

সুভদ্রা। যেই জন পুণ্যবান্, কে না তারে বাসে ভাল ?
তাহাতে মহত্ত্ব কিবা আর ?
পাপীরে যে ভালবাসে, আমি ভালবাসি তারে,
সেইজন প্রেমের আধার।
সুগন্ধ নির্গন্ধ ফুল বিরাজিছে সমভাবে
দেখ অঙ্কে মাতা বসুধার ;
সমুজ্জ্বল রত্নসহ, অনন্ত বালুকারাশি
বহিতেছে গর্ভে পারাবার।

না, দিদি, আমরা নারী, বিশ্বজননীর ছবি,
আমাদের শত্রু মিত্র নাই ;
বরিষার ধারামত, অজস্র জননী-প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই।
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা,
সেত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার ;
শত্রু মিত্র তরে যার সমভাবে কাঁদে প্রাণ,
সেইজন দেবতা আমার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[১২৬৮—]

কলিকাতা যোড়াশাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-বংশে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইঁনি দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের পৌত্র ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। অতি বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গান, সমালোচনা প্রভৃতি যে বিষয়ে ইনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাকেই ইঁহার প্রতিভা স্বর্ণমণ্ডিত করিয়াছে। এমন শব্দসম্পদ, এমন মার্জ্জিত ভাষা, এমন ছন্দোবৈচিত্র্য, এমন ভাবৈশ্বর্য্য পৃথিবীর অতি অল্প লেখকেরই দেখা যায়। উপমায় ইঁহাকে কালিদাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

"শারদা-মঙ্গলের" কবি বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীকে আধুনিক বঙ্গ-ভাষার প্রথম গীতি-কবি বলিলে অন্যায় হইবে না। রবীন্দ্রনাথ বিহারিলালের গুণমুগ্ধ শিষ্য ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভাষার একজন শ্রেষ্ঠ গীতি-কবি। গীতি-কবিতায় কবির নিজের হৃদয়-সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। এইজন্য কবির রহস্যময় হৃদয়ের সহিত যাঁহার সম্যক্ পরিচয় না থাকে, তাঁহার নিকট কবির রচনা অনেক সময় হেঁয়ালি বলিয়া মনে হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনাও এইজন্য হেঁয়ালির মত শুনায়। কবি

তাঁহার স্বরচিত "জীবন-স্মৃতি"তে এই হেঁয়ালি অনেকটা পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

অসংখ্য বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে হিন্দুর জীবন খর্ব্ব ও আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, স্বচ্ছন্দ গতিতে বাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না; হিন্দু সমাজের এই "আধমরা" নিস্তরঙ্গ স্থবির দেহে যৌবনের উদ্দাম তড়িত্তরঙ্গ ছুটাইতে হইবে;—ইহাই রবীন্দ্রনাথের আধুনিক অনেক রচনার লক্ষ্য।

কেবল বাঙ্গালা রচনা নহে; রবীন্দ্রনাথের ইংরাজী রচনার ঝঙ্কারেও সমস্ত জগৎ মুগ্ধ। ইনি স্বপ্রণীত "গীতাঞ্জলি" কাব্যের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন, তাহা পাঠ করিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ, ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে, ইহাকে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিবেচনায় "নোবেল প্রাইজ" নামক প্রায় লক্ষ টাকা মূল্যের পুরস্কার প্রদান করেন। তদবধি প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বহুদেশে, ইনি, সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া গমনপূর্ব্বক,ভারতের বাণী শুনাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেছেন।

বোলপুর শান্তি-নিকেতনে ইনি "বিশ্বভারতীর" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এক উদার সার্ব্বজনীন বিশ্বপ্রেমের ডোরে সমস্ত জগৎকে বাঁধা ইহার উদ্দেশ্য।

———

প্রাণ

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্যকরে, এই পুষ্পিত কাননে,
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যেন স্থান পাই।
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি-অশ্রুময় ;—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত,
যেন গো রচিতে পারি অমর-আলয়।
তা যদি না পারি, তবে বাঁচি যতকাল,
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই ;
তোমরা তুলিবে বলে' সকাল বিকাল,
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই।
হাসিমুখে নিও ফুল, তার পর হায়,
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায় !

বঙ্গমাতা

পুণ্য-পাপে দুঃখে-সুখে পতনে-উত্থানে,
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে,
হে স্নেহার্ত্ত বঙ্গভূমি ! তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিও না ধরে' ;

দেশদেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান,
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে,
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে করে'।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ স'য়ে, আপনার হাতে,
সংগ্রাম করিতে দাও ভালো-মন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে',
দাও সবে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া করে'।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননি,
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করনি।

মঙ্গল-শঙ্খ

জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে;
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই,
মগন মিথ্যা কাজে।
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি'
ধর গো পূজার থালি,
রত্ন-প্রদীপ খানি
যতনে আন গো জ্বালি';

ভরি' ল'য়ে ছুই পাণি
বহি' আন ফুল-ডালি,
মা'র আহ্বান-বাণী
রটাও ভুবন-মাঝে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুনগো শঙ্খ বাজে।

আজি প্রসন্ন পবনে
নবীন জীবন ফুটিছে ;
আজি প্রফুল্ল কুসুমে
তব সুগন্ধ ছুটিছে।
আজি উজ্জ্বল ভালে
তোল উন্নত মাথা,
নব-সঙ্গীত-তালে
গাও গম্ভীর গাথা ;
পর মাল্য কপালে
নব-পল্লব-গাঁথা ;
শুভ সুন্দর কালে
সাজ সাজ নব সাজে।
জননীর দ্বারে আজি ওই
শুন গো শঙ্খ বাজে।

বঙ্গে শরৎ

আজি কি তোমার মধুর মূরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে !
হে মাতঃ বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে অমল শোভাতে !
পারে না বহিতে নদী জল-ভার,
মাঠে মাঠে ধান ধরেনাক আর,
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল,
তোমার কানন-সভাতে !
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননি,
শরৎকালের প্রভাতে ।

জননি, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়াছে নিখিল ভুবনে ;
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে ।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রামপথে পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে ।

জননি! তোমার আহ্বান-লিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে!
তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল-বরণী;
শিশির ছিটায়ে করেছ শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে,
বাঁশী বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে , তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হ'তে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী।
বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত-শরীর জুড়ায়ে;
কুটীরে কুটীরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে, মাতা, কত আয়োজন!
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন,
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।

আয় আয় আয়, আছ যে যেথায়,
আয় তোরা সবে ছুটিয়া ,
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !
ও-পার হইতে আয় খেয়া দিয়ে,
ও-পাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে,
কে কাঁদে ক্ষুধায়, জননী সুধায়
আয় তোরা সবে জুটিয়া।
ভাণ্ডার-দ্বার খুলেছে জননী
অন্ন যেতেছে লুটিয়া !

মাতার কণ্ঠে শেফালি-মাল্য,
গন্ধে ভরিছে অবনী ;
জলধারা মেঘ-আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনক-কিরণে,
মধুর মহিমা হরিছে হিরণে,
কুসুম-ভূষণ-জড়িত-চরণে,
দাঁড়ায়েছে মোর জননী !
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

নগরলক্ষ্মী

দুর্ভিক্ষ শ্রাবস্তিপুরে যবে
জাগিয়া উঠিল হাহারবে,—
বুদ্ধ নিজ ভক্তগণে　　　শুধালেন জনে জনে—
"ক্ষুধিতেরে অন্নদান-সেবা,
তোমরা লইবে বল কেবা ?"

শুনি' তাহা রত্নাকর শেঠ,
করিয়া রহিল মাথা হেঁট।
কহিল সে কর যুড়ি—　　　"ক্ষুধার্ত্ত বিশাল পুরী,
এর ক্ষুধা মিটাইব আমি—
এমন ক্ষমতা নাই স্বামি !"

কহিল সামন্ত জয়সেন—
"যে আদেশ প্রভু করিছেন,
তাহা লইতাম শিরে,　　　যদি মোর বুক চিরে,
রক্ত দিলে হ'ত কোন কাজ,
মোর ঘরে অন্ন কোথা আজ ?"

শ্রাবস্তিপুর—ইহা উত্তর বিহারের এক নগরী ছিল।

নিঃশ্বাসিয়া কহে ধর্ম্মপাল—
"কি ক'ব এমন দগ্ধ ভাল,—
আমার সোনার ক্ষেত, শুষিছে অজন্মা-প্রেত,
রাজকর যোগান কঠিন,
হয়েছি অক্ষম দীনহীন।"

রহে সবে মুখে মুখে চাহি,
কাহারো উত্তর কিছু নাহি।
নির্ব্বাক্ সে সভা-ঘরে, ব্যথিত নগরী'পরে
বুদ্ধের করুণ-আঁখি দুটি,
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি!

তখন উঠিল ধীরে ধীরে,
রক্তভাল লাজ-নম্র-শিরে,
অনাথপিণ্ডদ-সুতা, বেদনায় অশ্রুপ্লুতা,
বুদ্ধের চরণ-রেণু ল'য়ে,
মুক্তকণ্ঠে কহিল বিনয়ে;—

"ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া,
তব আজ্ঞা লইল বহিয়া!
কাঁদে যারা খাদ্যহারা, আমার সন্তান তারা,
নগরীরে অন্ন বিলাবার,
আমি আজি লইলাম ভার।"

বিস্ময় মানিল সবে শুনি',—
"ভিক্ষুকন্যা তুমি যে ভিক্ষুণী!
কোন্ অহঙ্কারে মাতি লইলে মস্তক পাতি'
এ হেন কঠিন গুরু কাজ?
কি আছে তোমার কহ আজ?"

কহিল সে নমি' সবা কাছে—
"শুধু এই ভিক্ষাপাত্র আছে!
আমি দীনহীন মেয়ে, অক্ষম সবার চেয়ে,
তাই তোমাদের পাব দয়া,
প্রভু-আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

আমার ভাণ্ডার আছে ভরে,
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে।
তোমরা চাহিলে সবে, এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা-অন্নে বাঁচাব বসুধা,
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।"

বিজয়া—জয়, সিদ্ধি।

কত অজানারে জানাইলে তুমি

["গীতাঞ্জলি" হইতে উদ্ধৃত।]

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
পুরাণো আবাস ছেড়ে যাই যবে,
মনে ভেবে মরি কি জানি কি হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন,
সে-কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।
জীবনে মরণে নিখিল ভুবনে
যখনি যেখানে ল'বে,
চির জনমের পরিচিত ওহে
তুমিই চিনাবে সবে।
তোমারে জানিলে নাহি কেহ পর,
নাহি কোনো মানা, নাহি কোনো ভয়,

সবারে মিলায়ে তুমি জাগিতেছ,
দেখা যে সদা পাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

সাজি

ঈশ্বরের স্বরূপ

বচন-অতীত যাহা ক'য়ে কি বুঝান যায় ?
বিশ্ব যাঁর ছায়া হয়,
তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়,
সাদৃশ্য দিব কোথায় ?
যদ্যপি চাহ জানিতে,
ঐক্য-ভাব করি' চিতে,
চিন্তহ তাঁহায়।
পাইবে যথার্থ জ্ঞান,
নাশিবেক মিথ্যা ভাণ,
নাহি কোন অন্য উপায় ॥

রামমোহন রায়
(খ্রীঃ ১৭৭৪-১৮৩৩)

ঐক্য ভাব করি' চিতে—মনকে একাগ্র করিয়া ; অথবা "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় এই ভাব ধারণ করিয়া।

ভগবানের মহিমা

কি স্বদেশে, কি বিদেশে, যথায় তথায় থাকি,
তোমার রচনা মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি ॥
দেশভেদে কালভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণ সাক্ষী দেয় তোমার মহিমা,
তোমার প্রভাব দেখি না থাকি একাকী ॥

রামমোহন রায়

মাতৃভাষা

নানান্ দেশে নানান্ ভাষা ।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?
কত নদী সরোবর,
কিবা বল চাতকীর,
ধারাজল বিনা কভু ঘুচে কি তৃষা ?

রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু)
(১১৪৮-১২৩৫)

তোমার প্রভাব ইত্যাদি—তোমার শক্তি দেখিয়া অর্থাৎ তুমি যে সর্ব্বত্র আছ ইহা দেখিয়া, নিজে একাকী অসহায় আছি বলিয়া মনে হয় না ।

ধারাজল বিনা ইত্যাদি—চাতক বৃষ্টিজল ভিন্ন অন্য জল পান করে না বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে ।

মানব-প্রীতি

মানুষ আমার, ভাই, বড় প্রিয়ধন ;
মানুষ-মঙ্গল সদা করি আকিঞ্চন।
জন্মেছি মানুষ-অঙ্গে, বেড়েছি মানুষ-সঙ্গে,
মানুষের সুমুখেই হইবে মরণ।
মানুষেরি খাই পরি, মানুষেরি কর্ম্ম করি,
মানুষেরি তরে ধ'রে র'য়েছি জীবন।
মানুষের ব্যবহারে জ্বালায়েছে বারে বারে ;
চোটে গিয়ে নির্জ্জনেতে ক'রেছি গমন ,
সেখানে প্রকৃতি এসে, সুমুখে দাঁড়ায়ে হেসে,
প্রেমভরে দিয়েছেন গাঢ় আলিঙ্গন ;
তাঁর প্রেমে মগ্ন হ'য়ে, দ্রবীভূত প্রায় র'য়ে,
করি বটে কিছুদিন সময় যাপন ;—
পরে ভাল নাহি লাগে, কেবলই মনে জাগে
প্রিয়তম মানুষের মোহন আনন।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

(১২৪২-১৩০১)

বাল্মীকির কবিত্ব-লাভ

[রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, একদা মহর্ষি বাল্মীকি তমসা নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন, এক ক্রৌঞ্চমিথুন পরম আনন্দে বিহার করিতেছে। এমন সময়ে এক ব্যাধ শরনিক্ষেপ-পূর্ব্বক ঐ মিথুনের মধ্যে ক্রৌঞ্চটিকে বধ করিল। ক্রৌঞ্চকে রক্তাক্ত-কলেবরে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, ক্রৌঞ্চী কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার সেই কাতরতায় মহর্ষির হৃদয় ব্যথায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। করুণায় উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে হঠাৎ তিনি ব্যাধকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন,—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥ *

তাঁহার মুখ হইতে সহসা এইরূপ অপূর্ব্ব ছন্দোবদ্ধ ভাষা বহির্গত হওয়ায় মহর্ষি বিস্মিত হইলেন। জগতে এইরূপে কবিতার অবতারণা হইল। শোক হইতে প্রথম উৎপন্ন হওয়ায় কবিতার শ্লোক নাম হইল। ব্রহ্মার উপদেশানুসারে, বাল্মীকি শ্লোকে রামায়ণ রচনা করেন।

নিম্নলিখিত কবিতাটি কবিবর বিহারিলাল চক্রবর্ত্তীর "সারদামঙ্গল" হইতে উদ্ধৃত।]

* ওরে ব্যাধ, তুই যখন ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে প্রেমমুগ্ধ একটিকে হত্যা করিলি, তখন অনন্ত কালের জন্ত তুই আর কোথাও আশ্রয়লাভ করিবি না।

অম্বরে অরুণোদয়,
তলে দুলে দুলে বয়
তমসা তটিনী-রাণী কুল কুল স্বনে ;
নিরখি' লোচন-লোভা,
পুলিন-বিপিন-শোভা,
ভ্রমেন বাল্মীকি মুনি ভাবভোলা মনে।

শাখি-শাখে মন-সুখে,
ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী মুখে মুখে,
কতই আদর করে বসি দু'জনায় ;
হানিল শবরে বাণ,
নাশিল ক্রৌঞ্চের প্রাণ,
রুধিরে আপ্লুত-পাখা ধরণী লুটায়।

ক্রৌঞ্চী প্রিয় সহচরে
ঘেরে ঘেরে শোক করে,
অরণ্য পূরিল তার কাতর ক্রন্দনে।
চক্ষে করি' দরশন,
জড়িমা-জড়িত মন,
করুণ-হৃদয় মুনি বিহ্বলের প্রায় ;

পুলিন-বিপিন-শোভা—তমসা-তীরস্থিত বনের শোভা। শবর—ব্যাধ।
জড়িমা-জড়িত—বিষাদে আচ্ছন্ন।

সহসা ললাট-ভাগে,
জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা জাগে,
জাগিল বিজলী যেন নীল নবঘনে।

কিরণ-মণ্ডলে বসি',
জ্যোতির্ম্ময়ী সুরূপসী,
যোগীর ধ্যানের ধন ললাটিকা মেয়ে,
নামিলেন ধীর ধীর,
দাঁড়ালেন হ'য়ে স্থির,
মুগ্ধনেত্রে বাল্মীকির মুখপানে চেয়ে।
করুণ ক্রন্দন-রোল,
উত উত উতরোল,
চমকি বিহ্বলা বালা চাহিলেন ফিরে;
হেরিলেন রক্তমাখা,
মৃত ক্রৌঞ্চ ভগ্ন-পাখা,
কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে ক্রৌঞ্চী উড়ে ঘিরে ঘিরে।

একবার সে ক্রৌঞ্চীরে
আরবার বাল্মীকিরে,
নেহারেন ফিরে ফিরে যেন উন্মাদিনী।

জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা—সারদা; কবিতা-সুন্দরী। ললাটিকা—ললাট হইতে জাতা; কবি বাণীকে বাল্মীকির ললাট হইতে জাত কন্যারূপে বর্ণন করিয়াছেন; তপঃশুদ্ধবুদ্ধি মহর্ষির উদার উজ্জ্বল জ্ঞানবিমণ্ডিত ললাটই বাণীর জন্মের উপযুক্ত স্থান।

কাতরা করুণাভরে,
গান সকরুণ স্বরে,
ধীরে ধীরে বাজে করে বীণা বিষাদিনী।

সে শোক-সঙ্গীত-কথা,
শুনে কাঁদে তরু লতা,
তমসা আকুল হ'য়ে কাঁদে উভরায়;
নিরখি' নন্দিনী-ছবি,
গদ-গদ আদি কবি,
অন্তরে করুণা-সিন্ধু উথলিয়া ধায়।

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী

বায়ু

জন্ম মম সূর্য্যতেজে, আকাশমণ্ডলে;
যথা ডাকে মেঘরাশি,
হাসিয়া বিকট হাসি,
বিজলী উজলে।

উতরোল—উত—অত্যন্ত; রোল—শব্দ। উভরায়—উচ্চৈঃস্বরে।

কেবা মম সম বলে,
হুহুঙ্কার করি' যবে নামি রণস্থলে ?
কানন ফেলি উপাড়ি,
গুঁড়াইয়া ফেলি বাড়ী,
অটল অচলে ।
মহাশব্দে ক্রীড়া করি সাগর-উরসে ।
মথিয়া অনন্ত জলে,
সফেন তরঙ্গদলে,
ভাঙ্গি তুলে নভস্তলে,
ব্যাপি দিগ্‌দশে

বসন্তে নবীন লতা, ফুল দোলে তায় ।
যেন সেই বায়ু নহি,
অতি মৃদু মৃদু বহি'
প্রবেশি তথায় ;
পুষ্পগন্ধ চুরি করি' মাখি নিজ গায় ।

বেণু-খণ্ড-মধ্যে থাকি' বাজাই বাঁশরী
রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাই আসি,
আমিই মোহন বাঁশী,
সুরের লহরী ।

উরসে—বক্ষঃস্থলে । রন্ধ্র—ছিদ্র ।

জীবকণ্ঠে যাই আমি, আমি কণ্ঠস্বর।
আমি বাক্য, ভাষা আমি,
সাহিত্য-বিজ্ঞান-স্বামী
মহীর ভিতর।
সিংহের কণ্ঠেতে আমিই হুঙ্কার,
ঋষির কণ্ঠেতে আমিই ওঙ্কার,
গায়ক-কণ্ঠেতে আমিই ঝঙ্কার,
বিশ্ব-মনোহর।

কে বাঁচিত এ সংসারে আমার বিহনে ?
আমিই জীবের প্রাণ,
দেহে করি অধিষ্ঠান,
নিশ্বাস-বহনে।

উড়াই খগে গগনে।
দেশে দেশে ল'য়ে যাই বহি' যত ঘনে।
আনিয়া সাগর-নীরে,
ঢালে তারা গিরি-শিরে,
সিক্ত করি' পৃথিবীরে,
বেড়ায় গগনে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(১২৪৪-১৩০০)

সাহিত্য-বিজ্ঞান-স্বামী—সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভু, অর্থাৎ স্বররূপ আমি না থাকিলে স্বরাত্মক সাহিত্য-বিজ্ঞানের সম্ভব হইত না।

বালকের মুখ

তামসী নিশার শেষে দেখিয়া তপনে,
যত না আনন্দে রসে কল্পনা-নলিনী ;
গ্রহণান্তে তারাকান্তে নিরখি' গগনে,
যত না প্রমোদে মজে চিত্ত-কুমুদিনী ;
উছলে মানস-মাঝে ততোধিক সুখ,
হেরি' সরলতাধার বালকের মুখ।

সদা তথা খেলে হাসি মানস-মোহন,
সিঁদুরিয়া মেঘে যেন বিজুলী সুন্দর ;
সদা তথা হ'তে ঝরে মধুর বচন,
সুধাকর হ'তে যথা সুধার নির্ঝর।
সে আননে প্রফুল্লতা সদা প্রকাশিত,
মনে লয় যেন পদ্ম চির বিকশিত।

নাহি তথা চিন্তাজ্বর বিরাম-নাশক ;
নাহিক কলুষ তথা ধর্ম্ম-শান্তি-চোর ;
নাহি তথা দ্বেষহিংসা, দুরন্ত দংশক,
যথা সর্প, সদা পর-অপকারে ভোর ;
না আছে ছলনা তথা, নাহি কুকৌশল ;
শোভে মাত্র নির্দ্দোষিতা-কনক-কমল।

ধর্ম্ম-শান্তি-চোর—যাহা লোকের হৃদয় হইতে ধর্ম্ম ও শান্তি হরণ করে। ভোর—ব্যাপৃত। নির্দ্দোষিতা-কনক কমল—নির্দ্দোষিতা-রূপ স্বর্ণ-পদ্ম।

সে মুখের সুমধুর আধ আধ ভাষ
শুনিলে আহ্লাদ যত উথলে হৃদয়ে ;
পারে কি কখন দিতে সেরূপ উল্লাস
গাহিয়া গায়ক রাগ-তান-মান-লয়ে ?
অথবা কোকিলকুল বসন্তাগমনে,
কিংবা চারু শ্লোকমালা গাঁথি' কবিগণে ?

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
(খ্রীঃ ১৮৪৬-১৮৮৬)

মাতৃ-স্তুতি

না জন্মিতে আমি, মম মঙ্গল-কামনা !—
হেন প্রেম ধরে কোন্ জনা ?
পেতে সুত সুলক্ষণ, কত ব্রত আচরণ,
কত বা মনন দেবতায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি, আমায় !—

কে জানে, কিরূপে মাতা করেছ পালন !
নিজ সুখ সব বিসর্জ্জন !—
কখন বা অর্দ্ধাশন, কখন বা অনশন,
কত নিশি জাগরণ তায় !
দ, প্রসন্ন-মনা জননি, আমায় !

মলয়জ হেন মল মাখিয়াছ গায়,
স্মরিয়া হৃদয় গ'লে যায় !—
পীড়ায় পড়েছি যদি, কাঁদিয়া সৃজেছ নদী,
অনশনে দিন কেটে যায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি, আমায় !

বড় হ'য়ে করিয়াছি উপদ্রব যত,
সহিবারে কেবা পারে তত ?
চুল ধ'রে টানিয়াছি, হৃদে কত হানিয়াছি,
নখে কত চিরিয়াছি কায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি, আমায় !

স্থানান্তরে যদি কভু করেছি গমন,
না এলে না করেছ ভোজন ;—
কভু পথে কভু ঘরে, ভ্রমণ উদ্বেগ-ভরে,
মণিহারা ফণিনীর প্রায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি, আমায় !

কি সাধ্য আমার, কত করিব বর্ণন,
যত-যত দিয়াছি বেদন !
তবু তায় রুষ্ট নয়, যেইমাত্র দেখা হয়,
স্নেহ-জল স্রবিত ধারায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি, আমায় !

মম অপরাধ যদি কর, মা, গ্রহণ,
আমি তবে বাঁচি কতক্ষণ ?
মম বুদ্ধি বল যাহা, সব তুমি জান তাহা.
অবোধের দোষ পায় পায় !
প্রসীদ, প্রসন্ন-মনা জননি, আমায় !

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
(১২৪৪-১২৮৪)
("মহিলা" হইতে গৃহীত)

জন্মভূমি

কামিনীর কমনীয় কণ্ঠভূষা হারে
দ্যুতিমান্ মধ্যমণি যেমন সুন্দর ;
সেইরূপ সমুদয় মেদিনী-মাঝারে,
আছে দিব্য স্থান এক অতি মনোহর।

প্রকৃতির অতি প্রিয় সেই রম্য-স্থল,
ভাল বেছে দেছে তার মনোজ্ঞ ভূষণ ;
নয়নের অভিরাম বিটপী সকল,
সুমধুর ফলফুলে অতি সুশোভন।

দ্যুতিমান্—উজ্জ্বল। ভাল বেছে ইত্যাদি—প্রকৃতি বাছিয়া বাছিয়া উৎকৃষ্ট অলঙ্কারে তাহাকে সাজাইয়াছে। অভিরাম—সুন্দর।

বিতরে উজ্জ্বলতর কর তথা বিধু,
  সূর্য্যের সুবর্ণ করে দীপ্ত দিনমান ;
মেদুর সমীর সদা বহে মৃদু মৃদু,
  ভূতলে অতুল সেই রমণীয় স্থান।

বিশাল-বারিধি-মাঝে বহিত্র বাহিয়া,
  কর্ণধার নির্ভীক অনেক দেশে যায় ;
সুস্থ চিত্তে নহে কিন্তু রহে কোথা গিয়া,
  নিরখিতে সেই ভূমি চিত্ত সদা চায়।

অন্য ভূপ, লোলুপ সে দেশ-অধিকারে,
  বিপুল বিক্রমে যদি করে আক্রমণ ;
হেন কাপুরুষ নাহি, অবাধে তাহারে,
  প্রস্তুত সে প্রিয় ভূমি করিতে অর্পণ।

বদ্ধপরিকর সবে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে ধায়,
  গৃহ-সুখ-অভিলাষ দিয়া বিসর্জ্জন ;
জনম সফল ভাবি' লয় সে বিদায়,
  প্রিয়-দেশ-রক্ষা-দায় যাহার নিধন।

দিনমান—দিন ; সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্তকাল পর্য্যন্ত সময়। মেদুর—স্নিগ্ধ। বহিত্র—জলযান, নৌকা। লোলুপ—অত্যন্ত লুব্ধ। বদ্ধপরিকর—কোমর বাঁধিয়া। রক্ষা-দায়—রক্ষার প্রয়োজনে।

অঙ্গনা ভূষণ-প্রিয়া, সে দেশ-রক্ষণে,
অকুণ্ঠিতা উন্মোচনে গাত্র-অলঙ্কার ;
সুকেশিনী, শির-শোভা কেশের ছেদনে,
ক্ষুব্ধা নহে, যদি তাহে হয় উপকার।

ধন্য সে ধরণী-তলে অগ্রগণ্য ধাম !
যাহার মাহাত্ম্য আমি অক্ষম বর্ণনে ;
"স্বর্গাদপি গরীয়সী" যে ভূমির নাম
উজ্জ্বল করিতে সাধ করে সর্ব্বজনে।

এত অনুরাগ, কোন্ ভূভাগ উপর ?
যদি অল্পজ্ঞান কেহ সন্ধান না পায়,
যারে ইচ্ছা জিজ্ঞাসিলে পাইবে উত্তর,—
জন্মভূমি—সুখে তুমি বাস কর যায়।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
(১২৪৩-১৩০৭)

অঙ্গনা-ভূষণ-প্রিয়া ইত্যাদি—কবি স্বয়ং ইহার টীকায় লিখিয়াছেন,— সুলতান মামুদ যৎকালে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন হিন্দু মহিলাগণ হীরকাদি বিক্রয় ও স্বর্ণালঙ্কার দ্রবীভূত করিয়া যুদ্ধের সংস্থান পাঠাইয়াছিলেন। রোমানেরা কার্থেজ উচ্ছেদ বাসনায় যৎকালে উক্ত রাজ্য আক্রমণ করে, তখন তদ্দেশীয় নারীগণ, রজ্জুর অভাব হইলে, ধনুকের ছিলা বন্ধন জন্য মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন।

ধার্ম্মিকের মৃত্যুর প্রতি উক্তি

ওহে মৃত্যু! তুমি মোরে কি দেখাও ভয়?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।
যাহাদের নীচাসক্ত অবিবেকী মন,
অনিত্য-সংসার-প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ;
যারা এই ভবরূপ অতিথি-ভবনে,
চিরবাসস্থান ব'লে ভাবে মনে মনে;
পাপরূপ পিশাচ যাদের হৃদাসন,*
করি' আত্ম-অধিকার আছে অনুক্ষণ;
পরকালে যাহাদের বিশ্বাস না হয়,
প্রাণ-প্রিয়তম-প্রেমে মুগ্ধ যারা নয়;
হেরিলে নয়নে এই ভ্রূকুটি তোমার,
তাহাদেরি হয় মনে ভয়ের সঞ্চার।
সংসারের প্রেমে মন মত্ত নয় যার,
ভ্রূভঙ্গে তোমার বল কিবা ভয় তার?
প্রস্তুত সর্ব্বদা আছি তোমার কারণ,
এস, সুখে করিব তোমায় আলিঙ্গন।
যে অম্লান কুসুমের মধু-পান তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মন-মধুকরে;

যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু! তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত ;
কোনরূপে তোমায় করিলে অতিক্রম,
যাইব আনন্দে যথা সেই প্রিয়তম।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (সদ্ভাব-শতক)
(১২৪৪-১৩১৩)

প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাগমন

ধন্য ধন্য জন্মভূমি আনন্দ-ভবন,
কভু নয় তুল্য তার নন্দন-কানন।
স্বর্গ স্বর্গ করে লোকে সার তার নাম,
প্রকৃত সুখের স্বর্গ জনমের ধাম।
হয় হোক্ জন্মভূমি সৌন্দর্য্যবিহীন,
থাক্ তার চারি পাশে বিজন বিপিন ;
না থাক্ নিকটে নদ নদী সরোবর,
না রোক্ সেখানে কোন খাদ্য-পরিকর ;

সরণি—পথ।
পরিকর—সমূহ।

তবু তার কাছে সুরপুর কোন্ ছার,
যেখানে জনম যার তাই ভাল তার।

দেখ রে ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড দেশ কি কু-স্থান হায়!
এমন সুলভ রোদ দুর্লভ তথায়;
ছ'মাসে তপন নাকি কখন কখন,
দেখা যায় তড়িতের রেখার মতন;
যম-সম শিশির না ছাড়ে কভু তারে,
প্রোথিত সকল স্থল নিবিড় তুষারে;
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?

শুনেছি আফ্রিকা দেশ মহাভয়ঙ্কর,
বড়ই প্রখর তথা তপনের কর;
স্থানে স্থানে ভয়ানক মরুভূমি কত,
ক্ষুভিত পবনে হয় সাগরের মত;
কচিৎ জলদমালা বরষিয়া জল,
উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠ তার করে সুশীতল;
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে?

ল্যাপল্যাণ্ড - উত্তর-মেরু প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া বৎসরের অধিকাংশ সময় এই দেশ বরফে সমাচ্ছন্ন থাকে; সেখানে দিনের আলো আমাদের দেশের সন্ধ্যার আলোর মত।

উত্তর দক্ষিণ আর প্রশান্ত সাগরে,
ভাসিতেছে কত দ্বীপ সলিল-উপরে।
থাক্ তথা বাস করা, কথা শুনে তার,
হয় মনে নানারূপ ভয়ের সঞ্চার।
তথাপি সুধাও তার নিবাসীর কাছে,
তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে'

এই ত সে প্রিয়তম মম জন্মস্থান,
যার তরে ছিল সদা ব্যাকুলিত প্রাণ;
যার প্রীতিময়ী মূর্ত্তি চারুদরশন,
করিতাম এতদিন চিন্তা অনুক্ষণ;
আজ তার সেই মূর্ত্তি নিরখি' নয়নে,
মরি কি বিমল সুখ উপজিল মনে!
কাদম্বিনী বরষার সময়ে যেমন,
নিয়ত সলিলে করে ভূতল সিঞ্চন;
আজ এ জনমভূমি আমার তেমন,
করিছে অন্তরে কত সুখ-বরষণ।
অথবা তপন-আভা প্রভাত সময়,
যেরূপ প্রফুল্ল করে সরোজ-নিচয়;
জনম-ভূমির কান্তি আজ সে প্রকার,
হৃদয়-কমল ফুল্ল করিছে আমার।
কত শত রম্য স্থান করেছি ভ্রমণ,
হেরিয়াছি কত কত নগর শোভন;

কিন্তু তাহাদের সেই সুষমানিচয়,
আজ এ রূপের কাছে ছার জ্ঞান হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

চৈতন্যের সন্ন্যাস

[নিমাই, সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রবল ইচ্ছায়, কাহাকেও না বলিয়া, গভীর রাত্রিতে গৃহত্যাগ করেন। জননী শচী দেবী, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া, কোথাও নিমাইকে না দেখিয়া, আকুল অন্তরে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন।]

ডাকেন জননী— নিমাই! নিমাই!
প্রতিধ্বনি বলে— নাই। নাই! নাই!
ডাকিছেন যত, শোকসিন্ধু তত
উথলিয়া উঠে। কোথারে নিমাই?

গভীর নিশীথে দূর গ্রামান্তরে,
সেই প্রতিধ্বনি যাই যাই করে;
ভাবেন জননী, আসে গুণমণি,
ডাকেন উৎসাহে হরিষ-অন্তরে।

নিমাই ! নিমাই !— হা মাতা সরলে,
পাগলিনী হ'লে সকলেই ছলে ;
কাঁদ মা জননি ! তব গুণমণি
আঁধারে লুকায়ে অই গেল চ'লে !

অই গেল চ'লে পাগলের প্রায় ;
জাননা ত মাতা কে তারে লওয়ায় !
উন্নত আকাশে খধূপ প্রকাশে,
আপনার বেগে সে কি সেথা যায় ?

প্রবল আগুন জ্বলেছে ভিতরে,
আর তারে হেথা কেবা রাখে ধ'রে ;
তাই মহাবেগে যায় অনুরাগে,
পাপী জগতের পরিত্রাণ-তরে ।

ধরেছ জঠরে, তাই ব'লে তারে
পার কি রাখিতে আপন আগারে ?
যে কাজ সাধিতে আসা অবনীতে,
নিলেন ঈশ্বর সে কাজে তাহারে ।

নদীয়াতে ছিল তোমার নিমাই ;
আজি সে হইল পাপীদের ভাই ;
জগতের তরে সে যে প্রাণ ধরে,
বুঝিলে না, মাতা, কাঁদিতেছ তাই ।

খধূপ—হাওয়াই ।

এ-দিকেতে গোরা নিজ বেগে ধায়,
কেশব ভারতী আছেন যথায় ,
হরি-গুণ-গান করি' পথে যান,
প্রেমের সাগর উথলিয়া যায় !

নিশিতে ডাকিলে লোকে ধায় যথা,
নিজ মনে গোরা চলিয়াছে তথা ;
পাপীর ক্রন্দন করিছে শ্রবণ,
আরবার ভাবে জননীর কথা ।

বলেন সঘনে— ' কোথা দয়াময় !
রহিলা জননী, করো যাহা হয় ;
আমি দ্বারে দ্বারে ঘুষিব তোমারে,
এদেহে জীবন যতকাল রয় ।

প্রিয় নবদ্বীপ ! প্রিয় ভাগীরথি !
ছেড়ে যাই আমি, দেহ অনুমতি ;
হরি-সঙ্কীর্ত্তনে তোমা দুই জনে,
জুড়ায়েছি আমি যেমন শকতি ।

প্রিয় হরি নাম ঘুষিব বিদেশে,
দ্বারে দ্বারে যাব ভিখারীর বেশে ;
নিজে পায়ে ধরি' ভজাইব হরি,
হরিনামে পাপী ঘুচাইবে ক্লেশে ।

এত বলি' গোরা ন'দে ছাড়ি যায়,
ন'দেপুরী শোকে করে হায়, হায় !
কারে কি যে কর, জান হে ঈশ্বর !
দেখে শুনে কবি হতবুদ্ধি-প্রায় !

আঁধার

তরু, লতা, ফুলপুঞ্জ, কোকিল-কূজিত কুঞ্জ,
অলির ঝঙ্কার প্রাণ না চাহে আমার ;
রবি, শশী, তারাহার, হাসি-মুখ ললনার ;
কেবল তোমারে ভালবাসি হে আঁধার !
অসীম অনন্ত তুমি সম চিরদিন,
না হাস, না কাঁদ, নহ কালের অধীন।

তোমায় জানে না নরে, তাইত তোমারে ডরে,
অসময়ে তুমি সখা, কেহ নাহি আর ;
একক, বান্ধবহীন, আশার উচ্ছ্বাস লীন,
হৃদয়ে শুকায়ে যায় রোদনের ধার ;
জলে শুধু স্মৃতি চিতে চিতানল প্রায়।
তখন অভাগা তব মুখপানে চায়।

শুইয়া তোমার কোলে, অভাগা সকল ভোলে,
ঘুমায়, জাগে না আর, দেখেনা স্বপন ;
অনলে সলিল পড়ে, আর নাহি ঝড়ে নড়ে,
সংসার-সাগর-রোল করে না শ্রবণ ।
কারো অধিকার নাহি তব অঙ্কোপরে,
ঘৃণা, হিংসা, উপহাস স্পর্শ নাহি করে ।

গৃহ-মাঝে দীপ প্রায়, রবি আকাশের গায়,
কালের ফুৎকারে নিভে যাবে একদিন ;
তুমি তম নিরুপম, শান্ত ভীম-পরাক্রম,
ক্ষুদ্র নর ভাবে ক্ষুদ্র রবির অধীন ;
ব্যাপিয়া অসীম স্থান তব আয়তন
অদ্যাবধি নাহি যথা কালের গঠন ।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ
(১২৫০-১৩১৮)

তপোবল

[বিশ্বামিত্র রাজা ছিলেন। একদা তিনি বিস্তর সৈন্য সমভিব্যাহারে মহর্ষি বশিষ্ঠের তপোবনে উপস্থিত হন। মহর্ষি কামধেনু শবলার সাহায্যে তাঁহাদের যথোচিত অতিথি-সৎকার করেন। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট ঐ কামধেনু প্রার্থনা করেন।

বশিষ্ঠ দিতে অস্বীকার করিলে, বিশ্বামিত্র বলপূর্ব্বক গাভী আনয়নের জন্য সেনা প্রেরণ করেন। শবলার প্রভাবে সমস্ত সেনা নষ্ট হয়। তখন বিশ্বামিত্র, তপোবলের নিকট ক্ষত্রিয়-বল নিস্তেজ বুঝিয়া, ব্রহ্মর্ষিত্ব-লাভের জন্য তপস্যায় নিরত হন। অনেক বাধা-বিঘ্নের পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন।]

বিশ্বামিত্র। হে মানব!

ব্রহ্মর্ষিত্ব, দেব-দ্বিজ-কৃপায় লভিয়া,
আকাঙ্ক্ষা নহেক সম্পূরণ।
আকাঙ্ক্ষা আমার—
নরত্ব দুর্লভ অতি—বুঝুক মানব।
নাহি জাতির বিচার,
লভে নর উচ্চপদ তপোবলে।
তপ—দৃঢ় সহায় জীবনে ;—
প্রভাবে যাহার
ঘুচে নীচ সংস্কার,
মলিনত্ব হয় বিদূরিত ;
জন্মে আত্মবোধ,
ঘুচে তায় জনম-মরণ-ভ্রম।
উচ্চ হ'তে উচ্চতর স্তরে,
তপোবলে করে আরোহণ।

আত্মবোধ—আত্মজ্ঞান।

তপ অতুল সম্পদ,
দানে সেই উচ্চ পদ,
যেই পদ আকাঙ্ক্ষা যাহার।
সাধ্যাসাধ্য নাহিক বিচার,
পায় সর্ব্ব অধিকার ;
হীনজন অতি উচ্চ হয় তপোবলে।
বেদমাতা কোলে লন তারে,
বিহরে ব্রহ্মণ্যদেব হৃদয়-মাঝারে ;
তপের প্রভাব বুঝ মানব-মণ্ডল।
যদি মম উপদেশ করহ গ্রহণ,
বুঝিব - সফল মম শরীর ধারণ।
তপ—তপ—হও তপাচারী।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ
("তপোবল")

দানে—দান করে। বেদমাতা—গায়ত্রী। ব্রহ্মণ্যদেব—ব্রহ্মতেজ। তপ—সংস্কৃত তপস্ শব্দ, বাঙ্গালায় তপ শব্দ। ছাত্রদিগের তপস্যা কি? —"ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ" অধ্যয়নই ছাত্রদিগের তপস্যা।

সুখ

নাই কিরে সুখ ?   নাই কিরে সুখ ?
এ ধরা কি শুধু বিষাদময় ?
যাতনে জ্বলিয়া,   কাঁদিয়া মরিতে,
কেবলি কি নর জনম লয় ?
কার্য্যক্ষেত্র অই প্রশস্ত পড়িয়া,
সমর-অঙ্গন সংসার এই ;
যাও বীরবেশে কর গিয়ে রণ,
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে ?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ ;
সুখ, সুখ, করি' কেঁদনা আর ;
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।
সকলের মুখ হাসিভরা দেখে
পারনা মুছিতে নয়ন-ধার ?

পরহিত-ব্রতে পার না রাখিতে
চাপিয়া আপন বিষদ-ভার ?
আপনারে ল'য়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে ;
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

শ্রীমতী কামিনী রায়

মা আমার

যেই দিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি, অশ্রু সেই দিন করিয়াছি বিসর্জ্জন।
হাসিবার, কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি, মা 'আমার, মা আমার !

অনল পুষিতে চাহি আপনার হিয়া-মাঝে,
আপনারে অপরেরে নিয়োজিতে তব কাজে ;
ছোটখাটো সুখ-দুঃখ—কে হিসাব রাখে তার,
তুমি যবে চাহ কাজ, মা আমার, মা আমার !

অতীতের কথা কহি' বর্ত্তমান যদি যায়,
সে কথাও কহিব না, হৃদয়ে জপিব তায় ;
গাহি যদি কোন গান, গাব তবে অনিবার,
মরিব তোমারি তরে, মা আমার, মা আমার !

মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে,
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কেবা ধরে ?
যতদিনে না ঘুচিবে তোমার কলঙ্কভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ,—মা আমার, মা আমার !

শ্রীমতী কামিনী রায়
("আলো ও ছায়া")

ধর মোর কর

ধর মোর কর।
সুখে দুঃখে লোভে অহঙ্কারে,
যদি, দেব, ভুলিয়া তোমারে,
যাই দূরান্তর ;
রোগে শোকে দারিদ্র্যে সন্দেহে,
ভুলি' যদি তব পুত্র-স্নেহে
হই স্বতন্তর ;
ধর মোর কর।

ধর মোর কর।
দেহ মন অস্থির সতত,
গড়িতে—ভাঙ্গিতে চায় কত
বিশ্ব-চরাচর !
বারবার পড়ি, উঠি, ছুটি,
কত চাই, কত তুলি মুঠি—
অতৃপ্তি-কাতর !
ধর মোর কর।

ধর মোর কর।
অবসন্ন দেহ মন আজ,
অসমাপ্ত জীবনের কাজ !
মৃত্যু-শয্যা 'পর—
শূন্য দৃষ্টি, শীর্ণ বাহু তুলি'
কারে খুঁজি আকুলি' ব্যাকুলি' !
হে চির-নির্ভর,
ধর দুটি কর।

অক্ষয়কুমার বড়াল
(১২৭৩-১৩২৬)
("এষা")

ভাঙ্গিও না ভুল

প্রভো ! ভাঙ্গিও না ভুল।
তোমারি আশীষ বরে,
খাটি যেন তোমা তরে ;
কি দুঃখ ? হিংস্থক যদি ভাবে চক্ষুশূল ;
ভুলে যদি থাকি, প্রভো ! ভাঙ্গিও না ভুল।

প্রভো ! ভাঙ্গিও না ভুল।
বুঝিনে বেদান্ত তন্ত্র,
জানিনে তপস্যা মন্ত্র,
আমি তব, তুমি মম, এই জানি স্থূল ;
ভুলে যদি থাকি, প্রভো ! ভাঙ্গিও না ভুল।

প্রভো ! ভাঙ্গিও না ভুল ;
আমি কে ?—তা' বুঝি এই,
তুমি ছাড়া আমি নেই,
আমি তব অণুকণা, তব পদধুল ;
ভুলে যদি থাকি, প্রভো ! ভাঙ্গিও না ভুল।

ভাঙ্গিও না ভুল, প্রভো ! ভাঙ্গিও না ভুল।
এ ব্রহ্মাণ্ড রঙ্গভূমি,
এক অভিনেতা তুমি,
তবুও আমারি তুমি, শিখিয়াছি স্থূল।

ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্,
এ প্রাণ তোমার থাক্ ,
ও চরণ বুকে থাক্ হ'য়ে বদ্ধমূল।
জীবলীলা-অবসানে,
ওই প্রেম-সিন্ধু-পানে,
ছুটিবে জীবন-গঙ্গা করি কুল কুল ;
ভুলে যদি থাকি, প্রভো! ভাঙ্গিও না ভুল।

শ্রীমতী মানকুমারী বসু
(মাইকেল মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী)

ভারতবর্ষের মানচিত্র

শিক্ষক। দেখ, বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই; মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে, জলে পালিত আমরা।
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

ছাত্র। (প্রণাম করিয়া) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
পূরব পশ্চিম ব্যাপি' রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব! বলুন আমারে ?

শিক্ষক। নহে তুচ্ছ মসীরেখা ; অই হিমাচল,
ভারতের পিতৃরূপী ! জনক যেমন
স্নেহ-দানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা-দানে,
পালিছেন সযতনে। অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র ; কত সাধুজন,
বিরচি' আশ্রম সেথা, পূজি' ইষ্টদেবে,
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম ঐ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ। দেখ বামদিকে,
অই বদরিকাশ্রম ; মহামুনি ব্যাস,
বসি' যে আশ্রম-মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর ভারত-কথা। অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি' উদ্‌যাপন,

গৌরীশৃঙ্গ—Mount Everest. বদরিকাশ্রম—বদরিকা অর্থাৎ কুলগাছে বেষ্টিত মহর্ষি ব্যাসের আশ্রম। ভারত-কথা—মহাভারতের কথা।

আচার্য্য শঙ্কর—শঙ্করাচার্য্য ; কেরল (আধুনিক মালাবার) দেশের চিদম্বর গ্রামে ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় ও ৩২ বৎসর বয়সে কেদারনাথে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি তদানীন্তন বিকৃত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া বৈদিক ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বেদান্তের ভাষ্য ইঁহার রচিত।

লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধু-পদ-রেণু বক্ষে ধরি' যুগ যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি,—কর নমস্কার।

ছাত্র। অই যে চিত্রের বামে পঞ্চরেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার?

শিক্ষক। অই পঞ্চনদ বৎস! এই পুণ্যভূমি
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত,
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত
পবিত্রিলা এই দেশ; এই পঞ্চনদে
হৃদয়-শোণিত ঢালি' বীঁর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান;

পঞ্চনদ—শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা এই পাঁচটি নদী যে দেশে প্রবাহিত; আধুনিক পঞ্জাব। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া এই প্রদেশেই প্রথমে অবস্থান করেন; এই স্থানেই বেদ রচিত হয়।

পুরুরাজ—পুরু (Porus) পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে গ্রীকরাজ আলেকজন্দর বা সেকেন্দর বাদশাহ পঞ্জাব আক্রমণ করিলে, পুরু বীরত্বের সহিত তাঁহাকে বাধা দেন; কিন্তু শেষে পরাজিত হন। বন্দী অবস্থায় আলেকজন্দরের সম্মুখে আনীত হইলে, গ্রীক-বীর জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আপনার প্রতি কিরূপ ব্যবহার চাহেন?" পুরু বীরত্বের সহিত উত্তর করিলেন—"রাজার মত ব্যবহার।" আলেকজন্দর পুরুর বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ করেন।

রাজপুত্রভূমি—রাজপুতনা।

কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
র'য়েছে অঙ্কিত, বৎস! অমর ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন;
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে কটিবন্ধ সম
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার

শিক্ষক। অই বিন্ধ্যাচল, বৎস! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে—
না ছিল আর্য্যের বাস; অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধার-পূর্ণ। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে,

প্রতাপ—চিতোরের মহারাণা প্রতাপ সিংহ। ইনি কখনও মোগলদিগের অধীনতা স্বীকার করেন নাই; মোগলদিগের হস্ত হইতে চিতোর উদ্ধার করিবার জন্ম প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন।

পদ্মিনী—ভীমসিংহের অপূর্ব্ব রূপবতী পত্নী। দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন, ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া, ইঁহাকে লাভ করিবার জন্ম চিতোর আক্রমণ করেন। সতীত্ব-রক্ষার জন্ম পদ্মিনী অন্যান্য রাজপুত মহিলাগণের সহিত চিতারোহণ করেন।

কটিবন্ধ—কোমরবন্ধ। অগস্ত্য—মহাতপা মুনি। ইনি বিন্ধ্যপর্ব্বতের গুরু ছিলেন। বিন্ধ্য সূর্য্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার গতিপথ রোধ করিবার জন্য উঠিতে থাকেন। তখন দেবতাদের অনুরোধে অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট গমন করেন। বিন্ধ্য গুরুকে প্রণাম করিবার জন্য মস্তক অবনত করিলে, অগস্ত্য বলিলেন—যত-দিন আমি দক্ষিণ দিক্ হইতে ফিরিয়া না আসি, ততদিন ঐ অবস্থাতেই থাক। অগস্ত্য আর ফিরিলেন না; বিন্ধ্যও তদবধি নত হইয়া আছে।

এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে জনে,
শোভিছে এ দেশ-মাঝে। এই বন-ভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য ; রঘুকুলমণি
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা চীর ধরি'
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাহিয়া পুলকে
এখনও বহেন সেথা। পবিত্র এ-দেশ,
সীতারাম-পদস্পর্শে, কর নমস্কার।

ছাত্র। গুরুদেব ! কৌতূহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণ-যুগ ; কৃপা করি' তবে
কোথা বঙ্গভূমি আজি দেখান আমারে।

শিক্ষক। অই বঙ্গভূমি, বৎস ! হিমাদ্রি আপনি
মুকুট-আকারে হের শোভে শিরোদেশে ;
ধৌত করি' পদতল বহেন জলধি ;
নিত্য প্রক্ষালিত পূত ভাগীরথী-জলে
সুজলা, সুফলা, শ্যামা। ভূষারূপে তার
হের অই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ ; সাঙ্গোপাঙ্গ ল'য়ে,
বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা,

সাঙ্গোপাঙ্গ—সহচরগণ।

অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে। নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই ; পতিতপাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এ দেশ,
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ এই বর, বৎস! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে নিত্য বঙ্গভূমি মায়ে।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু

[খ্রীঃ ১৮৫৭—]

অজয়—ভাগীরথীর একটি শাখানদ। কেন্দুবিল্ব—প্রচলিত নাম কেঁদুলি ; এই গ্রামে সংস্কৃত "গীতগোবিন্দ" কাব্য-রচয়িতা জয়দেব গোস্বামী জন্মগ্রহণ করেন। তরিতে সগরবংশ—সূর্য্যবংশীয় রাজা সগর শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ৯৯টি পর্য্যন্ত যজ্ঞ করিলে পর, শততম যজ্ঞের বেলা ইন্দ্র, যজ্ঞের ঘোড়া চুরি করিয়া, পাতালে যোগমগ্ন কপিল মুনির আশ্রমে রাখিয়া আসেন। সগরের ষষ্টি সহস্র পুত্র,অশ্বের অনুসন্ধান করিতে করিতে কপিলাশ্রমে আসিয়া, মুনিকে চোর মনে করিয়া অবমানিত করেন ও কপিলের শাপে ভস্মীভূত হন। বহুকাল পরে, সগরের বংশধর ভগীরথ অনেক সাধনার পর গঙ্গাকে ভূতলে আনয়ন করেন। গঙ্গাজল-স্পর্শে সগর-সন্তানগণের উদ্ধার হয়।

আমার দেশ

বঙ্গ আমার! জননি আমার!

ধাত্রি আমার! আমার দেশ!

কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন,

কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!

কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,

কেন গো মা তোর মলিন বেশ!

সপ্তকোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে—

"আমার দেশ!"

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,

কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!

সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন—

"আমার দেশ!"

উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা

মুক্ত করিতে মোক্ষ-দ্বার,

আজিও জুড়িয়া অর্দ্ধ-জগৎ

ভক্তি-প্রণত চরণে যাঁর;

অশোক যাঁহার কীর্ত্তি ছাইল

গান্ধার হ'তে জলধি শেষ,

অশোক—মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র; খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৬৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গান্ধার—বর্ত্তমান আফগানিস্থান।

তুই কি না মাগো তাঁদের জননী,
তুই কি না মাগো তাঁদের দেশ ?

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন "আমার দেশ !"

একদা যাহার বিজয়-সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণব-পোত
ভ্রমিল ভারত-সাগর-ময় ;
সন্তান যার তিব্বত-চীন-জাপানে
গঠিল উপনিবেশ,
তার কি না এই ধূলায় আসন,
তার কি না এই ছিন্ন বেশ !

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন "আমার দেশ !"

বিজয়-সেনানী ইত্যাদি—বঙ্গদেশের রাজকুমার বিজয়সিংহ পিতা কর্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া লঙ্কায় গমন করেন ও সেই দেশ জয় করেন।

উদিল যেখানে মুরজমন্দ্রে
নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান,
ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি,
চণ্ডীদাসও গাইল গান ;
যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য ;
তুইত না সেই ধন্য দেশ !
ধন্য আমরা, যদি এ-শিরায়
থাকে তাঁদের রক্তলেশ !

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন "আমার দেশ !"

যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে
ঘেরে আছে আজ আঁধার ঘোর,
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা
ভাতিবে আবার ললাটে তোর ;
আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য,
মানুষ আমরা, নহিত মেষ !

মুরজ—মৃদঙ্গ। প্রতাপাদিত্য—যশোহরের রাজা ছিলেন। ইনি আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করায়, মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর ইঁহার দমনার্থ রাজা মানসিংহকে প্রেরণ করেন। জ্ঞাতিবিরোধের ফলে, প্রতাপ যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হন।

দেবি আমার ! সাধনা আমার !
স্বর্গ আমার ! আমার দেশ

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন "আমার দেশ !"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
(১২৭০-১৩২০)

অনন্ত হেঁয়ালি

অনন্ত হেঁয়ালি এই রচনা তোমারি !
কি যেন কুয়াসা দিয়ে রেখেছ আঁধারি' !
সাধিতে কি মহাকাজে, রেখেছ আকাশ-মাঝে,
কোটি সূর্য্য, কোটি ধরা দিগন্ত প্রসারি' ?
সুনীল বিশাল সিন্ধু কেন বা কল্লোলে ?
কেন কাঁদে নদ-নদী বসুধার কোলে ?

কল্লোলে—তরঙ্গ-গর্জ্জন করে।

কেন এ পাহাড় বন, কেন বহে সমীরণ,
চপলা চমকে, কেন মেঘ বর্ষে বারি ?
এ অনন্ত জীবে কেন ব্যাপিয়ে রেখেছ ধরা ?
কেন ক্ষুধা, কেন তৃষ্ণা, কেন মৃত্যু, কেন জরা ?
দু'দিনের তরে এসে, কেন সবে কেঁদে হেসে,
কোথায় চলিয়া যায় বুঝিতে না পারি !

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সখা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ !
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,
চির-অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু'হাত পসারি'
ধ'রে টেনে কোলে নিয়েছ !
"ও পথে যেওনা, ফিরে এস," ব'লে
কানে কানে কত ক'য়েছ ;

(আমি)—তবু চ'লে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি-মুখে তুমি ব'য়েছ ;
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে ক'রে নিয়ে র'য়েছ !

রজনীকান্ত সেন
(১২৭২-১৩১৭)
(বাণী)

সতত শিয়রে জাগো

আহা, কত অপরাধ ক'রেছি, আমি
তোমারি চরণে, মাগো !
তবু কোল-ছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চ'লে গেলে না গো !
আমি, চলিয়া গিয়াছি 'আসি' ব'লে,
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখি-জলে,
কত আশীষ ক'রেছ, ব'লেছ—"বাছারে,
যেন সাবধানে থাকো ;

আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ-ভ'রে,
মা, মা ব'লে ডাকো।"

যবে মলিন হৃদয় তপ্ত,
ল'য়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত,
ব'লেছি, "মা, আমি করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো।"
তুমি, মুছি' আঁখি-জল, বলিয়াছ, "বল,
আর ও পথে যাবনাকো।"
আমি, পড়িয়া পাতক-শয়নে,
চাহি চারিদিকে দীন-নয়নে,
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি,
মা, তবু নাহি রাগো;
আমি দেখি বা না দেখি, বুঝি বা না বুঝি,
সতত শিয়রে জাগো!

রজনীকান্ত সেন
(কল্যাণী)

বেলা যায়

একদা পল্লীতে কোন রজকের গেহে,
ডাকিছে বালিকা এক ব্যাকুলিত স্নেহে
নিদ্রিত পিতারে,—"ওঠ, বাবা, বেলা যায়!"
অস্তমান সন্ধ্যাসূর্য্য অন্তর্হিত-প্রায়।
বালিকার কম্প্রকণ্ঠ চঞ্চল পবনে
সঞ্চারিল স্তব্ধতায়। শিবিকারোহণে,
অদূরে গৃহের পথে ফিরিছেন যথা
লালাবাবু কর্ম্মস্থল হ'তে, দু'টি কথা
চ'লে গেল সেথা। নিস্তব্ধ শিবিকা-মাঝে
ধ্বনিল কম্পিত কণ্ঠ মর্ম্মাহত লাজে,—
"ওরে বেলা যায়!"—বিস্মিত বাহকগণ
নামা'ল শিবিকা। লালা, কম্পিত-চরণ,
দাঁড়াইয়া জীবনের প্রশান্ত সন্ধ্যায়,
আপনারে উঠিল ডাকিয়া—"বেলা যায়!"

কম্প্রকণ্ঠ—কম্পিত কণ্ঠস্বর। সঞ্চারিল স্তব্ধতায়—নীরবতা ভেদ করিয়া ছুটিল। লালাবাবু—পাইকপাড়ার জমিদার বংশের আদিপুরুষ; ইনি বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাস করিয়াছিলেন।

ফেলিলেন খুলি' বসন ভূষণ যত ;
ভৃত্যগণে দিলেন বিদায় স্বপ্নাহত ;
শুভক্ষণে আপনারে কুড়া'য়ে লইলা
বান্ধববিহীন। অবোসর, বাহিরিলা
ধরণীর মুক্ত ক্রোড়ে। জলে বহ্নিকণ
ছল-ছল নেত্রপ্রান্তে ; কি জানি দাহন
অনুতপ্ত উচ্চ হৃদয়ের ! ঊর্দ্ধে চাহি'
নিশ্বাসিলা। কোথা হ'তে উঠিলেক গাহি'
সেই দুটি কথা, 'বেলা যায়' 'বেলা যায়',
বিশাল অনন্ত ভরি' গম্ভীর সন্ধ্যায়।
অকিঞ্চন রশ্মিলেশ কম্পিত পাথারে
গেল অস্তে হারাইয়া ! কোথা গেল রবি
সুদূর দিগন্ধ মাঝে ! মুছে গেছে ছবি
দৃপ্ত দিবসের। ফিরে আসে গাভীগুলি
অর্দ্ধভুক্ত তৃণ ফেলি' ; হেরিয়া গোধূলি
কর্ম্মব্যস্ত কৃষাণেরা লইল বিদায়
ধান্যপূর্ণ ক্ষেত্রপাশে রুদ্ধ বেদনায় !
হেরিলা অধীরে প্রৌঢ়, চারিদিক্-ভরা

স্বপ্নাহত—স্বপ্নের অর্থাৎ মোহের অবস্থায় আহত হইয়া, অর্থাৎ মোহ হইতে জাগিয়া। আপনারে কুড়ায়ে লইলা ইত্যাদি—এতদিন বিষয়-চিন্তায় তাঁহার মন নানাদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এখন তাহাকে একাগ্র করিলেন ও সমস্ত সংসার-বন্ধন ছিন্ন করিলেন। অকিঞ্চন—তেজোহীন। দিগন্ধমাঝে—দিগন্তের অন্ধকারের মধ্যে। পাথারে—সমুদ্রে।

কেবল বিদায়-যাত্রা ; মুক্ত, মায়াহরা,
মহান্ গমন !—ছুটিলা তৃষিত মনে
কা'র শুভ করুণার শুভ আকর্ষণে !
লক্ষ কোটি নভ আঁখি সাক্ষী হ'ল তার,
নীরবে দেখাল পথ নাশি' অন্ধকার।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী
[১২৭৯—]

ধূমধারা

[কবিবর নবীনচন্দ্র বলেন—স্থানীয় লোকেরা নর্ম্মদার জল-প্রপাতকে ধূমধারা বলে। ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে, প্রস্তর-গর্ভে বেগে জলধারা পড়িয়া যে জলকণা উদ্গিরণ করে, তাহা দূর হইতে ঠিক ধূমের মত বোধ হয়। সেইজন্য এই জল-প্রপাতের নাম ধূমধারা হইয়াছে।]

পথশ্রান্ত ক্লান্ত দেহ, চলে না চরণ,
অগ্রসরি' চলিয়াছি, ভেঙ্গে পড়ে মন।
কি দেখিতে কোন্ আশে, আসিনু এ দূরদেশে,
শুধু ক্ষুদ্র বনপথ, তরুলতা, বন ;
তারই তরে এত ক্লেশ, এতই পীড়ন !

মুক্ত—বন্ধনবিহীন। মায়াহরা—মায়ানাশক।

সহসা সরিয়া গেল বনের আঁধার,
মুক্ত হ'ল পথ যেন সম্মুখে আমার।
সহসা কে কলরোলে, সম্মুখে বহিয়া চলে,
কার এই রূপরাশি অসীম অপার?
হেরিয়া ফিরাতে আঁখি পারি না যে আর!

আপনার রূপভরে আপনি মাতিয়া,
নর্ম্মদা! কোথায় তুমি চলেছ ছুটিয়া?
ভাঙ্গিয়া প্রস্তর-কারা, দূরে ফেলি' বিঘ্ন সারা,
কোন্ সুখে কার আশে অধীর হইয়া,
নর্ম্মদা! এমন ভাবে চলেছ ছুটিয়া?

রজতের ধারা যেন প'ড়ে ছড়াইয়া,
বাষ্পসম ধূমধারা উঠিছে পড়িয়া।
লীলাময়ি! লীলারঙ্গে ভাসাইয়া দেছ অঙ্গে,
তোমার রূপেতে মুগ্ধ পাষাণের হিয়া,
তোমাতে মিশিয়া গেছে গলিয়া ঝরিয়া।

হেরি' এ মহান্ দৃশ্য, নয়নে আমার
জেগে উঠে বিশ্ব-রূপ অসীম অপার।
যাঁর সৃষ্টি এই ধরা, এত স্নেহ-প্রেম-ভরা,
কি কৌশল—কি আশ্চর্য্য লীলারাশি তাঁর!
হৃদয় চরণে তাঁর লুটে বার বার।

অমনি সকলি ভুলি' তাঁহার লাগিয়া,
ছুটে যাক্ আত্মহারা আমার এ হিয়া ;
ভাঙ্গিয়া এ দেহ-কারা, ভুলি' এ জীবন সারা,
আকাঙ্ক্ষা কামনারাশি সব বিসর্জ্জিয়া,
লভি শান্তি প্রীতি প্রাণে তাঁহারে লভিয়া।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী
(সাহিত্য, মাঘ, ১৩১৯)

খাসিয়া পাহাড় *

যে দিকে ফিরাই নেত্র, প্রকৃতির লীলাক্ষেত্র,
পাহাড়ের উপরে পাহাড় ;
শাল, ঝাউ, দেবদারু, শোভে কত বনতরু,
কোথা শুধু লতা গুল্ম ঝাড়।
শীর্ণকায়া গিরিনদী কলনাদে নিরবধি,
বহে স্বচ্ছ-শীতল-সলিলা ;
কোথাও পাথরে ঠেকে, চলিয়াছে এঁকে বেঁকে,
সর্প-সম করি' কত

* শিলং যাইতে হইলে এই পর্ব্বতমালার উপর দিয়া মোটরগাড়ী করিয়া যাইতে হয়।

কোথাও নির্ঝর ঝরে, ফেনপুঞ্জ শোভা করে,
আসে শব্দ শ্রবণ মোহিয়া ;
গতিভঙ্গে খরস্রোতা, ক্রুদ্ধ বারিরাশি কোথা,
দৈত্যসম উঠে গরজিয়া।
কোথাও পর্ব্বত পরে, গো-মেষ-ছাগল চরে,
দূর হ'তে নিরখে নয়ন,
যেন লাল সাদা কালা, পাথরের খণ্ডগুলা,
রচিয়াছে বিচিত্র আসন।
মরি কি বিচিত্র সৃষ্টি !— নীচে হইতেছে বৃষ্টি,
ঊর্দ্ধে হাসে রবির কিরণ ;
কোথাও তূলার রাশি, কেমন চলেছে ভাসি,
আবরিয়া পর্ব্বত কানন।
নয়নের অভিরাম, মাঝে ছোট ছোট গ্রাম,
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী-কূলে ;
বিঘা কয় জমি জুড়ে, দশ পাঁচ খানা কুঁড়ে,
কারও কুঁড়ে তরু-শাখে ঝুলে।
কোথাও হরিৎ মাঠে, খাসিয়া রমণী খাটে,
স্বাস্থ্যে যেন সর্ব্ব-অঙ্গ ভরা ;
পৃষ্ঠে দশমণ বোঝা, তবু চলিতেছে সোজা,
স্বকার্য্য-সাধনে কিবা ত্বরা !
মধ্যাহ্নে তরুর তলে, বসে আসি দলে দলে,
বিছাইয়া ডাল্ রুটি ভাত ;

মা'র কাছে আসে ধেয়ে, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে,
হেসে হেসে বাড়াইয়া হাত।
মুখ ভরা গুয়া পানে, হাসে খেলে খোলা প্রাণে,
তবু তায় কেমন সরম ;
বিদেশী দেখিলে পরে, এক পাশে যায় স'রে,
অন্য দিকে ফিরায়ে নয়ন।
পরিধানে মোটা গড়া, নাহি জানে লেখাপড়া,
পূজা করে ভূত, গাছ, সাপ ;
যাহা পায় তাই খায়, বোঝা বোঝা মলা গায়,
নাহি জানে কিবা পুণ্য পাপ।
কিন্তু কভু কারো কাছে, খাসিয়া না ভিক্ষা যাচে,
কারো সঙ্গে করে না চাতুরি ;
নিজশ্রমে যাহা পায়, সদা তুষ্ট থাকে তায়,
জানে না কাহারে বলে চুরি।
সভ্যতার আলো এসে, ক্রমে খাসিয়ার দেশে,
ধীরে ধীরে করিছে প্রবেশ ;
এখন চাতুরি চুরি, শিখিতেছে নরনারী,
পরস্পর করে হিংসাদ্বেষ।
ঘোর অন্ধ তমিস্রায়, কে ডুবে থাকিতে চায় ?
কে না চায় সভ্যতার আলো ?
দীনতা হীনতা যত, হ'ক তাহা অপগত,
কেন যায় যাহা ছিল ভালো ?

এই সব দেখে শুনে, সময়ে সময়ে মনে,
দারুণ সংশয়, হায়, উঠে,—
অসভ্যেরে দিয়া আলো, কত তার করি ভালো,
কত তার ভালো লই লুটে !

রঘুর আতিথেয়তা

[মহাকবি কালিদাস-প্রণীত "রঘুবংশের" পঞ্চম সর্গ হইতে অনূদিত।]

বিশ্বজিৎ-যজ্ঞে কোষ করিয়া নিঃশেষ,
রিক্ত রঘু নৃপমণি ; এ হেন সময়,
উপনীত কৌৎস ঋষি, বিদ্যা করি' শেষ,
গুরু-দক্ষিণার তরে, রাজার আলয়।

কীর্ত্তিমান্, আতিথেয়, অতুল্য-স্বভাব,
নৃপতি, সাজা'য়ে অর্ঘ্য মৃন্ময় ভাজনে,—
স্বর্ণ-পাত্রের আজি একান্ত অভাব !——
পূজিলা বিদ্বদ্বর অভ্যাগত জনে।

বিশ্বজিৎ—এই যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ সর্ব্বস্ব দান করিতে হয়।

যথাবিধি তপোধনে পূজি' যশোধন,
সাদরে বসায়ে কাছে আসন উপর,
কৃতাঞ্জলিপুটে কন বিনয় বচন,—
কর্ত্তব্যে রঘুর মত কে আছে তৎপর ?—

"মন্ত্রস্রষ্টা ঋষিদের শ্রেষ্ঠ গুরু তব,
ল'ভেছ অশেষ জ্ঞান প্রসাদে যাঁহার,—
সূর্য্য হ'তে যেইমত চৈতন্য-উদ্ভব,—
তীক্ষ্ণবুদ্ধে ! সেই গুরু কুশলী তোমার ?

আলবাল-জলে নিত্য কত সে যতনে,
সুতস্নেহে বিবর্দ্ধিত আশ্রম-পাদপ—
শ্রান্তি-নাশ করে যারা দিয়া অনাতপ—
তাহাদের কোন পীড়া হয় না ত বনে ?

ব্যালভয়ে, সদ্যোজাত যেই মৃগগণে
অঙ্কে ধরি' পালেন স্নেহার্দ্র ঋষিগণ ;
হোম-কুশও নহে যারা নিষিদ্ধ ভক্ষণে,—
নির্ব্বিঘ্নে তাহারা করে জীবন ধারণ ?

যেই জলে ঋষিদের হয় নিত্যস্নান,
পিতৃগণ পান যার তর্পণ-অঞ্জলি ;

মন্ত্রস্রষ্টা—যাঁহারা মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। আলবাল—গাছের গোড়ায় জল দিবার জন্য জলাধার। অনাতপ—ছায়া। ব্যাল—হিংস্র জন্তু।

শোভা পায় যাহাদের তীরে উঞ্ছধান,
বিঘ্নহীন সেই তীর্থ-সলিল সকলি ?

যথাকাল-উপনীত-অতিথি-সেবার,
কিংবা ঋষিদের প্রাণ-ধারণ-কারণে,
নীবার প্রভৃতি ধান্য জনমে যা' বনে,
গ্রাম্য গো-মহিষে ক্ষতি করে না ত তার ?

সম্যক্ শিখায়ে বিদ্যা, গৃহী হইবারে
মহর্ষি দেছেন আজ্ঞা প্রসন্ন হৃদয় ?
সর্ব্বাশ্রম-হিতকর দ্বিতীয় আশ্রমে
প্রবেশের এই তব প্রশস্ত সময়।

পূজ্য তুমি, আসিয়াছ আমার আলয়,
উৎসুক এ চিত তব আদেশ-পালনে ;
গুরুর আদেশে, কিংবা নিজ প্রয়োজনে,
এসেছ, আমার পরে হইয়া সদয় ?"

যদিও উদার অতি রঘুর বচন,
তবু অর্ঘ্যপাত্রে বুঝি' অবস্থা তাঁহার,
কার্য্যসিদ্ধি-আশা কৌৎস করিয়া বর্জ্জন,
কহিতে লাগিলা কথা উত্তরে রাজার।—

উঞ্ছ—মাঠে ছড়ান ধান যাহা একত্র সংগৃহীত করা হয়।

"সর্ব্বত্র কুশলী মোরা শুন হে রাজন্ !
তব রাজ্যে প্রজাদের কোথা অমঙ্গল ?
সূর্য্য যবে দেয় কর, তমিস্রা তখন
পারে কি ঢাকিতে লোক-লোচন-কমল ?

তব কুলোচিত এই ভক্তি পূজ্য জনে ;
পূর্ব্বগণও পরাজিত ভক্তিতে তোমার ;
অসময়ে অর্থিরূপে তোমার সদনে
আসিয়াছি, এই হেতু বিষাদ আমার।

সৎপাত্রে সর্ব্বস্ব দিয়া, দেহমাত্র ল'য়ে
শোভিতেছ, হে রাজন্ !—নীবার যেমতি
আপনার শস্যভার পরহিতে দিয়ে
স্তম্বমাত্র-অবশিষ্ট শোভা পায় অতি।

সার্ব্বভৌম নৃপ তুমি, যজ্ঞেতে নির্ধন,
এ দারিদ্র্য, হে রাজেন্দ্র, উপযুক্ত তব ;
পালাক্রমে চন্দ্রকলা পিয়ে দেবগণ,
বৃদ্ধি হ'তে সেই ক্ষয়ে শশীর গৌরব।

অন্যত্র চলিনু তাই সংগ্রহ করিতে
গুরুর দক্ষিণা ;—তব হউক মঙ্গল ;

পালাক্রমে ইত্যাদি—চন্দ্রের ষোলটি কলা বা অংশ এক এক দেবতা পান করিয়া থাকেন।

চাতক মেঘাম্বু বিনা না পারে বাঁচিতে,
তবু শূন্য শরদ্ঘনে যাচেনাকো জল।"

এত বলি' কৌৎস ঋষি যান উঠিবারে,
নিষেধ করিয়া তাঁরে কহিলা নৃপতি ;—
"হে বিদ্বন্! কি সে বস্তু দিবে যা' গুরুরে,
কিবা পরিমাণ তার, কহ মহামতি!"

"বিদ্যা শেষ করি', কবি' গুরুপদে নতি,
কহিলাম—লহ, গুরো, দক্ষিণা তোমার।
কহিলা মহর্ষি—তব অচলা ভকতি
শ্রেষ্ঠ গণি, ইহা হ'তে কি দক্ষিণা আর?

"বারংবার অনুরোধে, ধরি' ক্রুদ্ধভাব,
দারিদ্র্যের কথা মোর না বিচারি' হায়,—
'চতুর্দ্দশ বিদ্যা তুমি করিয়াছ লাভ,
দেহ চৌদ্দ কোটি ধন ;'—কহিলা আমায়।

অর্ঘ্যপাত্রে বুঝিয়াছি, কেবল তোমার
প্রভু শব্দ অবশিষ্ট, ওহে নৃপমণি!
অল্প নহে পরিমাণ গুরু-দক্ষিণার,
অন্যায় প্রার্থনা হবে, তাই মনে গণি।"

শরদ্ঘন—শরৎকালের মেঘ। চতুর্দ্দশ বিদ্যা—শিক্ষা (বর্ণোচ্চারণবিষয়ক শাস্ত্র), কল্প (বেদাঙ্গ), ব্যাকরণ, নিরুক্ত (বেদের অভিধান) জ্যোতিষ, ছন্দঃশাস্ত্র, চারিবেদ (সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব); মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্র।

দ্বিজরাজসমদ্যুতি, নিষ্কলুষ-মন,
সসাগরা ধরণীর এক অধীশ্বর,
বেদবিদ্‌-অগ্রগণ্য ঋষির বচন
শুনিয়া, কহিলা পুনঃ উদার অন্তর।—

"শেষ করি' সর্ব্ব বিদ্যা, গুরুদক্ষিণার
প্রার্থী হ'য়ে আসি' দ্বিজ রঘুর সকাশে,
ব্যর্থমনোরথ গেলা অন্যজন-পাশে,
এ নব কলঙ্ক যেন না হয় আমার।

পবিত্র পূজিত মম অগ্নির আগারে,
চতুর্থাগ্নি সম, দেব, কর অধিষ্ঠান
দিন দুই তিন, কৃপা করিয়া আমারে;
সাধিতে তোমার কার্য্য করিনু প্রস্থান।"

প্রভাতে প্রয়াণোদ্যত ধরণী-ঈশ্বরে,
বিস্ময়ে কহিলা আসি' ভাণ্ডারিকগণ,—
"মহারাজ! শূন্য কোষ-গৃহের ভিতরে,
আকাশ হইতে হয় স্বর্ণ বরিষণ।"

দ্বিজরাজসমদ্যুতি—চন্দ্রের তুল্য কান্তিবিশিষ্ট। চতুর্থাগ্নি—দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই তিন অগ্নি; অগ্নির ন্যায় পবিত্র ও তেজঃসম্পন্ন বলিয়া কৌৎসকে চতুর্থ অগ্নি বলা হইয়াছে।

যুদ্ধভীত-কুবের-প্রদত্ত উপায়ন,
বজ্রভিন্ন সুমেরুর শৃঙ্গের সমান,
অপূর্ব্ব প্রভায় দীপ্ত যতেক কাঞ্চন,
সমস্তই কৌৎসে রাজা করিলেন দান।

"দক্ষিণা-অধিক ধনে নাহি প্রয়োজন"—
কন্ ঋষি; রাজা কন্—"সমস্ত তোমার।"
উভয়ের এ চরিত্র করিয়া দর্শন,
করে সাধুবাদ যত প্রজা অযোধ্যার।

মেথর

কে বলে তোমারে, বন্ধু, অস্পৃশ্য অশুচি?
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমারি পিছনে;
তুমি আছ, গৃহবাসে তাই আছে রুচি,
নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।
শিশুজ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে,
ঘুচাইছ রাত্রিদিন সর্ব্ব ক্লেদ গ্লানি;
ঘৃণার নাহিক কিছু স্নেহের মানবে,—
হে বন্ধু, তুমিই একা জেনেছ সে বাণী।

নির্ব্বিকারে আবর্জ্জনা বহ অহর্নিশ,
নির্ব্বিকার সদা শুচি তুমি গঙ্গাজল।
নীলকণ্ঠ করেছেন পৃথ্বীরে নির্ব্বিষ ;
আর তুমি ? তুমি তারে করেছ নির্ম্মল।
এস বন্ধু, এস বীর, শক্তি দাও চিতে,—
কল্যাণের কর্ম্ম করি, লাঞ্ছনা সহিতে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(১২৮৮-১৩২৯)

মাতৃহারা

মাতৃহারা শিশু বিমাতার ক্রোড়ে
উঠিতে বাড়া'ল হাত ;
বিমাতা বলিল— "আরে ম'লো, এ কি,
কোথাকার উৎপাত !
সতীনের কাঁটা, কখনও কোথাও,
সুখী কি ক'রেছে কারে ?
নিজে সে মরিল, মোরে জ্বালাইতে
রেখে গেল মেয়েটারে !"

নীলকণ্ঠ ইত্যাদি—সমুদ্র-মন্থনে যে বিষ উঠিয়াছিল, তাহাতে পৃথিবী নষ্ট হইবে দেখিয়া মহাদেব তাহা পান করিয়াছিলেন ; সেইজন্য তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়।

ভ্রূকুটি করিয়া, মুখ ফিরাইয়া,
চ'লে গেল গরবিণী ;
সজল নয়নে ফিরিয়া আসিল
মাতৃহারা অভাগিনী !

হেলায় ফেলায় বাড়িছে বালিকা,
বিমাতারও হ'ল মেয়ে ;
কোলে কোলে খুকী বেড়ায় সদাই
সবার আদর পেয়ে।
পূজার সময় আসিল খুকীর
বসন ভূষণ-রাশি ;
মা-হারা বালিকা রহে সারারাত
অভিমানে উপবাসী !

অভাগিনী ভোগে বিষম অসুখে
কে রাখে সংবাদ তার ?
বৃদ্ধা দাসী তার চিকিৎসা করিল
জলপড়া করি' সার !
বিমাতার মনে উপজিল আশা,
কণ্টক ঘুচিবে এবে ;
'অখণ্ড-আয়ু যে সে পোড়া-কপালী,
সে কেন মরিতে যাবে ?

সে উঠিল বেঁচে, খুকীর হইল,
যকৃৎ বিকৃতি ব্যাধি ;
ডাক্তার বৈদ্যের ব'সে গেল হাট,
মা নিশা জাগেন কাঁদি'।
লাল নীল সাদা কত সে ঔষধ
গুঁড়া বড়ী কত আর,
সকলই বিফল ! হায় সে বাঁচে কি
পরমায়ু নাহি যার ?

মূর্চ্ছিতা জননী তনয়ার শোকে,
লভি' জ্ঞান অবশেষে,
ছুটিল যথায় ভূমিতে নিদ্রিত
মাতৃহারা দীনবেশে !
বুকে তুলে তারে করিল চুম্বন,
সলিলে ভরিল আঁখি ;
মা-হারা আবার পাইয়া মাতায়,
"মা—মা" ব'লে উঠে ডাকি' !

কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
(১২৮৮-১৩০৪)
[সাহিত্য-সংহিতা, কার্ত্তিক, ১৩২০]

নির্ম্মম বিধান

শক্তির অধিক মোরে উচ্চ অভিলাষ
দিয়া কেন বাড়াইলে অনন্ত যন্ত্রণা ?
পাষাণ-প্রাকার-রুদ্ধ স্রোতের উচ্ছ্বাস
ব্যক্ত করে তটিনীর ব্যর্থ উন্মাদনা !
নির্ম্মম বিধাতা !   এ কি নিয়ম তোমার ?
নিষ্ঠুর বালক যথা খাদ্য-প্রলোভন
দেখায়ে ছুটায় মাত্র কুক্কুরে তাহার ;
পরে, অবসন্ন-দেহ, বিক্ষত-চরণ,
যবে সে লুটায় ভূমে, হৃদয়-বিহীন
প্রভু তার দাঁড়াইয়া হাসে খল খল !—
ছুটাতেছ তেমতি আমারে নিশিদিন,
হাসিতেছ হেরি' মোর যতন বিফল !
এ কি উৎপীড়ন !   এ কি শক্তি-অপচয় !
এ বিশ্ব-বিধানে, হায়, নাহি কি হৃদয় ?

কুমুদরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

[সাহিত্য-সংহিতা, ভাদ্র, ১৩২১]

প্রার্থনা

শত্রু যদি দিতে হয়, দাও তবে ভীষ্ম সম,

ওহে জগদীশ!

যার শরজাল দেয় বক্ষঃ চিরি' পরাজ্ঞান,

শিরে শুভাশীস্।

চাহিনাকো মিত্র আমি, সে যদি শকুনি সম

চাটু-সুধা মাখি'

সেবন করায়ে নিত্য কুপথ্য-গরলরাশি

মৃত্যু আনে ডাকি'।

কর গো ভিখারী মোরে, সে যদি বিদুর সম

চির-তৃপ্ত-প্রাণ;

মধুর ক্ষুদের লাগি' যার দ্বারে দ্বারে ফিরে

আসে ভগবান্।

করোনাকো নৃপ মোরে, সে যদি যযাতি সম

ভোগে অন্ধ হায়,

পরা—ব্রহ্মবিদ্যা। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ করিলেও, তাঁহাদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ও তাঁহাদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছিলেন। বিদুর—ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা; ইনি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের অশ্রদ্ধার অন্ন ত্যাগ করিয়া বিদুরের শ্রদ্ধাদত্ত ক্ষুদও সাদরে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র; শুক্রশাপে অকালে জরাগ্রস্ত হইয়া, ইনি আপন জরা গ্রহণ করিবার জন্য প্রত্যেক পুত্রকে অনুরোধ করেন। সকলেই তাহাতে অসম্মত হইল, কেবল কনিষ্ঠ পুত্র নিজ যৌবন পিতাকে দান করিয়া, পিতার জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নিজ-জরা-বিনিময়ে, পুত্রের যৌবন তরে
মরে পিপাসায়।
দাও, প্রভু, পরাজয়, যদি সে বলির মত
ত্রিভুবন-হারা,
বিকাইতে পারি শির, বালক-বামন-পদে
লভি' চির-কারা।
চাহিনাকো জয় তবু সমগ্র ভারত রাজ্য
জিনিয়া সমরে,
স্বজন-সন্ততি-হারা, কুরুক্ষেত্র শ্মশানের
সিংহাসন 'পরে।

বলির মত—দৈত্যরাজ বলি প্রহ্লাদের পৌত্র ছিলেন। ইনি যজ্ঞ করিয়া বামন-মূর্ত্তিধারী কৃষ্ণকে ত্রিপাদপরিমিত ভূমি দান করিতে প্রতিশ্রুত হন কৃষ্ণ দুই পদে স্বর্গ ও মর্ত্ত আচ্ছাদন করিয়া, নাভি-কমল হইতে নির্গত তৃতীয় পাদ রাখিবার স্থান প্রার্থনা করেন। বলি আপনার মস্তক প্রদান করেন। বলির ভক্তিতে বদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ তাঁহার দ্বারী হইয়াছিলেন।

স্বজন-সন্ততি-হারা ইত্যাদি—কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে, সমরক্ষেত্রে সমবেত উভয় পক্ষের সেনা দেখিয়া অর্জ্জুনও এই কথা বলিয়াছিলেন।—

কম্পান্বিত-কলেবর, খ'সে পড়ে ধনুঃশর,
অর্জ্জুন কাতর কণ্ঠে কন্—
"আত্মীয়-স্বজনগণে নিহত করিয়া রণে
রাজ্য নাহি চাহি নারায়ণ!
গুরুবধ মহাপাপ, সহিতে নারি সে তাপ,
ভিক্ষান্নও ভাল তাহা হ'তে;
আত্মীয়-রুধির-লিপ্ত ভোগে হায় নহে তৃপ্ত
আমার হৃদয় কোনমতে।" গীতা।

চিরবর্ষা দাও মোরে, জীবনে আসুক বন্যা
প্রচণ্ড দুর্ম্মদ ;
বর্ষণে বিদারি' বক্ষ আনে যেন সুধা-স্নিগ্ধ
শ্যামল সম্পদ।
চাহিনা ফাল্গুন আমি, ফুলদল-কিসলয়ে
অলস সুন্দর ;
সে যদি স্বপন ভাঙ্গি' নিয়ে আসে বৈশাখের
ব্যথিত মর্ম্মর।

শ্রীকালিদাস রায়
[প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩১৮]

পল্লী-মা

পল্লীমায়ের বুক ছেড়ে আজ যাচ্ছি চলে' প্রবাস-পথে,
মুক্ত মাঠের মধ্য দিয়ে জোর-ছুটানো বাষ্প-রথে।
উদাস হৃদয় তাকায়ে রয় মায়ের শ্যামল মুখের পানে,
বিদায়-বেলার বিয়োগ-ব্যথা অশ্রু আনে দুই নয়ানে।

চির-চেনার গণ্ডী কেটে বাইরে এসে আজকে প্রাতে,
নূতন করে' দেখা হ'ল অনাদৃতা মায়ের সাথে ;
ভক্তি-পূজা দিইনি যারে ভুলেও যাহার বক্ষে থেকে,—
নম্রশিরে প্রণাম করি দূর হ'তে তার মূর্ত্তি দেখে' !

সে যদি স্বপন ভাঙ্গি' ইত্যাদি—অর্থাৎ যে বিলাসের পরিণামে দুঃখ-ব্যথা অবশ্যম্ভাবী সে বিলাস আমি চাহি না।

স্নেহময়ীর রূপ ধ'রে মা দাঁড়িয়ে আছে মাঠের 'পরে,
মুক্ত চিকুর ছড়িয়ে গেছে দিক্ হ'তে ওই দিগন্তরে।
ছেলে-মেয়ে ভিড় করেছে চৌদিকে তার আঙিনাতে,
দেখ্ছে মা সেই সন্তানেরে পুলক-ভরা ভঙ্গিমাতে।

ওই যে মাঠে গরু চরে লেজ দুলিয়ে মনের সুখে ;
ওই যে পাখীর গানের সুরে কাঁপন জাগে বনের বুকে ;
মাথাল্-মাথায়, কাস্তে-হাতে, ওই যে চলে কালো চাষা,
ওরাই মায়ের আপন ছেলে—ওরাই মায়ের ভালোবাসা।

রাখাল ছেলে চরায় ধেনু, বাঁজায় বেণু অশথ্-মূলে,
সেই গানেরই পুলক লেগে ধানের ক্ষেত ওই উঠ্ল দুলে ;
সেই গানেরই পুলক লেগে বিলের জলের বাঁধন টুটে',
মায়ের মুখের হাসির মত কমল-কলি উঠ্ল ফুটে।

দুপুর-বেলার রৌদ্র-তাপে ক্লান্ত হ'য়ে কৃষক-ভায়া
বস্ল এসে গাছের তলে ভুঞ্জিতে তার স্নিগ্ধ ছায়া ;
মাথার উপর ঘন-নিবিড় কচি-কচি ওই যে পাতা,
ও যেন মা'র আপন হাতে তৈরী-করা মাঠের ছাতা।

সবুজ ধানে মাঠ ছেয়েছে, কৃষক তাহা দেখ্লে চেয়ে,
রঙীন আশার স্বপ্ন এল নীল-নয়নের আকাশ ছেয়ে !
ওদেরই ও ঘরের জিনিষ, আমরা যেন পরের ছেলে,
মোদের ওতে নাই অধিকার—ওরা দিলে তবেই মেলে !

মাথাল—রৌদ্রবৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মস্তকের আবরণ ; টোকা।

ওই যে লাউয়ের জাংলা-পাতা ঘর দেখা যায় একটু দূরে,
কৃষক-বালা আস্‌ছে ফিরে পুকুর হ'তে কলসী পূরে' ;
ওই কুঁড়ে ঘর—উহার মাঝেই যে চির-সুখ বিরাজ করে,
নাই রে সে সুখ অট্টালিকায়, নাই রে সে সুখ রাজার ঘরে।

কত গভীর তৃপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ, নাই বা জানুক,—সে কথা মোর মনই জানে!
মায়ের গোপন বিত্ত যা, তার খোঁজ পেয়েছে ওরাই কিছু,
মোদের মত তাই ওরা আর ছুটেনাকো মোহের পিছু।

গোলাম মোস্তফা

[প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩৩০]

জাংলা—মাচা।

উপহার

শশব্যস্তে চ'লে গেলে স্বর্গের আহ্বানে !
ফেলে গেলে মোর কাছে—বোধ হয় ভুলি',
অথবা যতনে আমি রাখিব, এ জ্ঞানে,—
অফুটন্ত কুসুমের ঝরাপাতাগুলি।
স্নেহের সলিলে সিক্ত, সুষমা-মণ্ডিত,
আজও তাহা শান্ত, স্নিগ্ধ, দিব্য বাস তুলি'
স্মৃতির আঁধার কক্ষ করে আমোদিত,
হর্ষ-বেদনায় চিত্ত উঠয়ে আকুলি' !
কবি-কুঞ্জে সারাবেলা ভ্রমিলাম আজি,
বিমুগ্ধ নন্দন-গন্ধে ; বাণীর চরণে
দিব ব'লে, ফুল তুলে ভরিলাম সাজি ;
স্বরগীয় সেই সব কুসুমের সনে
দু' একটি ঝরাপাতা দিনু উপহার,
দেখে যদি প্রীতি হয় তোমার আত্মার !

সমাপ্ত